সরল বিচারে অদ্বৈতবাদ

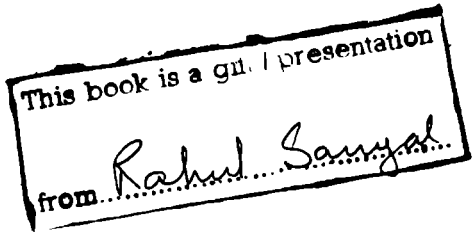

শ্রীতেজোময় ঘোষ এম্. এস সি ; এফ. আই. এ

Ramakrishna Math
Probationers' Training Centre Library
P. O.-Belur Math, Howrah

12
151.4
G

প্রকাশক : শ্রীতেজোময় ঘোষ
১৮এ ল্যান্সডাউন্ টেরাস্
কলিকাতা-২৬

CALL NO............
ACC. NO 12,421

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮০ ; মে ১৯৭৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

৭·৫০
মূল্য—[redacted] টাকা

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৩

Ramakrishna Math
Probationer's' Training Centre Library
P. O.-Belur Math, Howrah

উৎসর্গ

[illegible] ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য ও লীলা-[illegible] সারদা দেবীর অক্লান্ত, একনিষ্ঠ সেবক ; শিবজ্ঞানে জীবের [illegible] প্রচারে ও পালনে স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ; [illegible] ও জ্ঞান যাঁহাতে সমান ধারায় প্রবাহিত ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-[illegible]পূর্ব গ্রন্থরচনার মাধ্যমে এ যুগে হিন্দুধর্মের মর্মের ব্যাখাতা ; [illegible] ও [illegible]হিষ্ণুতার ঘনীভূতমূর্তি ; সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী—যাঁহার অহেতুক [illegible] প্রারম্ভেই গ্রন্থকারের জীবন ধন্য হইয়াছে—সেই গুরুদেব [illegible] স্বামীজী মহারাজের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারের এই দীন অর্ঘ ভক্তিপূর্ণ-[illegible] হইল।

প্রণত গ্রন্থকার

ভূমিকা

অনেক আন্তরিক সাধক আছেন যাঁহারা ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে কৃত নিষ্কাম কর্ম উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা অনেকাংশে শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অদ্বৈতবাদের কথা অস্পষ্টভাবে শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উহা স্পষ্টরূপে জানিবার ও বুঝিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। এরূপ সাধকদিগের পক্ষে কিন্তু এ পথে আর অধিক অগ্রসর হওয়া বর্তমান্ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এই বাংলাদেশে আদৌ সহজসাধ্য নয়। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ এই যে এই তত্ত্ব আধুনিক পদ্ধতিতে, সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, সহজ ভাষায় বুঝাইবার মত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অতি বিরল; প্রায় নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। পক্ষান্তরে এরূপ একটি ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে অদ্বৈতবাদ একটি অত্যন্ত জটিল তত্ত্ব। এমনকি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকটও উহা প্রায় ক্ষেত্রেই একটি বিভীষিকার ও উপেক্ষার বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। এক সময় নৈয়ায়িক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অদ্বৈতবাদের বিপক্ষে অনেক কূট যুক্তি-তর্ক উদ্ভাবন করিয়া উহাকে খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এ সকল যুক্তি-তর্ক অখণ্ডিত রহিয়া গেলে লোকে অদ্বৈত-তত্ত্বস্বরূপ অমৃত হইতে বঞ্চিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় লোক-কল্যাণার্থে ও ঈশ্বরেচ্ছায় অনেক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বিরুদ্ধবাদীগণের তর্কক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তাহাদিগের কূট তর্কজাল সুযুক্তি কূট যুক্তি-তর্ক দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গিয়াছেন। এ সকল বিষয় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট অবশ্যই সহজবোধ্য নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ষড়্‌দর্শন অধ্যয়নপূর্বক এ সকল যুক্তি-তর্ক আয়ত্ত করিবার মত সময়, শক্তি ও প্রবৃত্তি এ যুগে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই থাকা সম্ভব। অপর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সহায়তা ব্যতিরেকে একক এরূপ প্রচেষ্টার ফলে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কাও কিছু কম নহে। সুখের বিষয় এই যে অদ্বৈততত্ত্বের অনুভূতি লাভ দ্বারা কৃতকৃত্য হইতে ইচ্ছুক সাধকের পক্ষে এ সকলের কোনই প্রয়োজন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন যে অপরের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে ঢাল তলোয়ার ইত্যাদির প্রয়োজন হয়; নিজেকে বধ করিবার জন্য একটি নরুণই যথেষ্ট। অর্থাৎ, বিরুদ্ধবাদীগণের কণ্ঠরোধ করিতে হইলে

অনেক পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু নিজের উপলব্ধির পক্ষে অদ্বৈতবাদ মোটেই কোনও জটিল তত্ত্ব নয়। সরল শ্রুতিসম্মত বিচার বলে যে সাধক যাবতীয় দৃশ্যবর্গের মিথ্যাত্ব সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট বিরুদ্ধবাদীদের কূট যুক্তি-তর্কের স্থান কোথায়? জগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে তবেই না যত যুক্তি-তর্ক?

একটু শান্ত ও একাগ্র হইয়া ঠিক পথে চিন্তা করিলে সাধক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন যে অদ্বৈততত্ত্বের ন্যায় সরল তত্ত্ব আর কিছুই হইতে পারে না। আর তত্ত্বটি যিনিই আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি ইহাও উপলব্ধি করেন যে এ তত্ত্ব অতি মনোরম, অতি মহান্, অতি গম্ভীর ও নিরতিশয় আনন্দ, শান্তি ও অভয়প্রদ। তিনি এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ হন যে এই অদ্বৈত-তত্ত্ব ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও সমগ্র মানবজাতি—সকলের পক্ষেই পরম কল্যাণকর। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই কথাটাই বুঝাইবাব চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে অতি সাধারণ সরল যুক্তির সাহায্যে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উহার সমর্থনে আচার্য গৌড়পাদ, আচার্য শঙ্কর প্রভৃতির কিছু কিছু উক্তি উদ্ধৃত ও ব্যাখাত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ দেখান হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণকে সাধক কিরূপে নিজ অনুভূতিতে পরিণত করিয়া অদ্বৈততত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন সে বিষয়ে কিছু বলা হইয়াছে। এবং অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধির ফলে সাধক কৃতকৃত্য হইয়া যে আনন্দময় জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ করেন তাহার কিছু বর্ণনা পঞ্চম, অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া যদি একজন জিজ্ঞাসু সাধকও গন্তব্য পথে চলিবার ব্যাপারে কিঞ্চিন্মাত্রও উপকৃত বা উৎসাহিত হন, তবে নিজ পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

কলিকাতা
৫ই মে, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ
২২শে বৈশাখ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ
অক্ষয় তৃতীয়া

শ্রীতেজোময় ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রথম অধ্যায়	
অদ্বৈততত্ত্বের পক্ষে সরল যুক্তি-প্রমাণ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আচার্যগণের উক্তি-প্রমাণ।	৫৮
তৃতীয় অধ্যায়	
শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ	৭২
চতুর্থ অধ্যায়	
অনুভূতি-প্রমাণ ও তাহার সাধন	১০৫
পঞ্চম অধ্যায়	
জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণসকল	১৪০

চিত্র—

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য

('উদ্বোধনে'র সৌজন্যে)

সরল বিচারে অদ্বৈতবাদ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক ; ইহা তাহার অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া আছে। এই জিজ্ঞাসার সুরুতেই কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে জগতের যাবতীয় বস্তুকে নিম্নলিখিত, পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

(ক) আমি, অর্থাৎ যে সব কিছুর জ্ঞাতা ; এবং

(খ) অন্য সব কিছু, যাহা আমার জ্ঞেয়, যথা :—

(i) বাহ্য জগৎ, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ, পর্বত, নদ, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি।

(ii) আমার স্থূল দেহ।

(iii) আমার দেহস্থ প্রাণ-শক্তি। ইহা আমি চোখে দেখিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব, ক্রিয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে ; সুতরাং ইহাও আমার জ্ঞেয়।

(iv) আমার মন আছে তাহা আমি জানি ; সেই মন নানা সময়ে নানা আকার ধারণ করে—অর্থাৎ তাহাতে নানা চিন্তা উঠে—তাহাও আমি জানি। সুতরাং মনও আমার জ্ঞেয়।

(v) সেইরূপে, আমার যে বুদ্ধি আছে তাহাও আমি জানি। অন্য ব্যক্তিবিশেষের তুলনায় আমার বুদ্ধি কম বা বেশী সে বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে। আমার বুদ্ধি কখনও বা প্রখর বা সজাগ থাকে,

কখনও বা তাহা থাকে না—তাহাও আমি জানিতে পারি। তাই আমার বুদ্ধিও আমার জ্ঞেয়।

(vi) সর্বশেষে, আমাতে যে অহঙ্কার, অর্থাৎ দেহাদিতে "আমি"—বুদ্ধি আছে, (যাহাকে ইংরাজীতে ego বলা যাইতে পারে), হঠাৎ যাহাকে প্রকৃত আমি বলিয়া ভুল হইতে পারে—যে আমিটা কখনও সুখী, কখনও বা দুঃখী হয়, "এটা করিলাম", "সেটা করিতেছি"—বলিয়া মনে করে, সেই অহঙ্কার বা কর্তা-ভোক্তা আমিটাও আমার জ্ঞেয়। অপর লোকে সুখী বা দুঃখী হইলে যেমন আমি তাহা নানা লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারি, ঠিক সেইরূপই আমার মধ্যস্থ যে আমিটা কখনও সুখী, কখনও বা দুঃখী হয় তাহাও আমি জানিতে পারি। সুতরাং এই অহঙ্কার বা কাঁচা আমি বা ক্ষুদ্র আমিটাও আমার জ্ঞেয়। বিষয়টি একটু সূক্ষ্ম—সুতরাং পাঠক যদি এ বিষয়টি পূর্বে চিন্তা না করিয়া থাকেন তবে যেন ইহা একটু ধীরভাবে চিন্তা করেন ; তবেই ইহা তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইবে। জ্ঞাতা আমিই যে প্রকৃত আমি এবং কর্তা-ভোক্তা আমি যে প্রকৃত আমি নয়, এ বিষয়টির আরও বিচার ২(খ) (ii) অনুচ্ছেদে করা হইতেছে।

যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়কে উপরে যেভাবে ও যে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হইল তাহাতে বিশেষ কোনও তাৎপর্য নাই ; সে সকলকে অন্যরূপেও ভাগ করা যাইতে পারিত। মূলকথা এই যে বাহ্য হউক বা আন্তর হউক, স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক, বিষয়মাত্রই আমার জ্ঞেয়। প্রতিটি বিষয়ের সহিত আমার জ্ঞেয়-জ্ঞাতা সম্বন্ধ ; বিষয়টি জ্ঞেয় এবং আমি তাহার জ্ঞাতা।

এই জ্ঞাতা (subject) ও জ্ঞেয় (object) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলে, বিশ্বজগতের সব কিছুই জানা হইবে—তখন আর অন্য কিছু জানিবার থাকিবে না। সুতরাং এই দুইটির সম্বন্ধেই আমাদের সম্যক্ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জ্ঞাতাকে দ্রষ্টা বা সাক্ষীও বলা হয় এবং জ্ঞেয়কে দৃশ্য বা সাক্ষ্যও বলা হইয়া থাকে।

২। (ক) প্রথমে জ্ঞাতার সম্বন্ধেই অনুসন্ধান করা যাউক। এই যে আমিটা সব কিছু জানে—যাহাকে আত্মাও বলা হয়—তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি ? এই বিষয়ে প্রথম লক্ষণীয় এই যে এই আমির বা আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ (axiomatic)। আমি যে আছি—এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই—যদিও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা না থাকিতে পারে। আমি আছি কিনা তাহা জানিবার জন্য অন্য কাহারও নিকট ছুটিয়া যাই না। আমি যে আছি এ কথা অন্য কাহারও জানার উপর, অন্য কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর করে না। অন্য সব বিষয়ের অস্তিত্বই কিন্তু আমার জানার উপর নির্ভরশীল। অন্য কোনও কিছু আছে বলিয়া তখনই বলি বা মনে করি যখন তাহার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান আমার হয়। আমার অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়া তবেই যত কিছু চিন্তা, বিচার বা যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে। সুতরাং আমির—প্রকৃত আমির—প্রথম লক্ষণ এই যে সে আছে। "আমি" রূপ ভিত্তির উপরই বাকি সব কিছু প্রতিষ্ঠিত। "আমি নাই" এ কথা বলিতে, ভাবিতে বা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে গেলেও ঐ "আমি"রই প্রয়োজন। "আমি"কে কখনও বাদ দেওয়া যায় না।

(খ) (i) দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু আমি জ্ঞাতা, সেই হেতু আমি জ্ঞেয় নই—কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এ দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বস্তু। জ্ঞাতা, "জানা" এই ক্রিয়ার কর্তা এবং জ্ঞেয়, ঐ ক্রিয়ার কর্ম। কোনও ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম কখনও এক হয় না ; কারণ তাহারা ক্রিয়াটির সহিত বিভিন্নরূপে—বিপরীত সম্বন্ধে—সম্পৃক্ত। কোনও

ক্রিয়াতে কর্তা ও কর্মের ভূমিকা এক হয় না; তাহাদের ভূমিকা পরস্পর বিপরীত। আবার যে জ্ঞাতা সে চেতন এবং যে জ্ঞেয় সে জড়। আমি যখন কিছু জানি তখন ঐ জানা ব্যাপারটিতে যে চেতনের ভূমিকার প্রয়োজন, তাহা শুধু আমারই। যাহাকে জানি তাহাতে চৈতন্য থাকিবার কোনও প্রশ্ন নাই; সে মানুষ হইতে পারে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, মৃত্তিকা, প্রস্তর, লৌহখণ্ড, যাহা কিছু হইতে পারে। তাহার কোনও চেতনের ভূমিকা নাই; তাহার ভূমিকা জড়ের। বস্তুতঃ পরস্পর পৃথক ও বিপরীত ভাবাপন্নরূপে অনুভূত দুইটি বস্তুকে বুঝাইবার জন্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইটি পৃথক্ শব্দের ব্যবহার। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যে কোনও জ্ঞেয় বিষয়ই হউক আমি তাহার জ্ঞাতা বলিয়া আমি তাহা হইতে পৃথক্—আমি তাহা নহি; অর্থাৎ আমি জ্ঞেয় নহি।

(ii) যেহেতু আমি জ্ঞাতা সেই হেতু আমি জ্ঞেয় নহি; সুতরাং আমাতে আকার, সীমা, বিকার, অন্তর, বাহির, উৎপত্তি, বিনাশ, গুণ, ক্রিয়া কোনও রূপ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি—সংক্ষেপে যাহাদিগকে "নাম-রূপ" বলা হয়—তাহার কিছুই নাই। যদি উহাদের কিছু আমার থাকিত তবে আমি জ্ঞাতা হইতে পারিতাম না—জ্ঞেয়ই হইয়া যাইতাম। কারণ, যাহার নাম-রূপ আছে তাহা অবশ্যই জ্ঞেয়; কেননা, কোনও কিছু যদি জ্ঞেয় হয় বা জানা যায়, তবেই শুধু বলা যায় যে উহার আকার এই প্রকার, বা সীমা ঐখানে বা তাহার বিকার এবংবিধ, ইত্যাদি। কিন্তু আমি যেহেতু জ্ঞাতা, সেই হেতু আমি চেতন—অর্থাৎ আমাতে চৈতন্য আছে। অর্থাৎ আমাতে চৈতন্য আছে কিন্তু নাম-রূপ নাই। সুতরাং আমি অসীম, অনন্ত, নিরাকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরংশ, নীরন্ধ্র, উদয়হীন, অস্তহীন, অন্তর্বহিঃশূন্য, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র। বলা বাহুল্য যে আমি দেহ নই, প্রাণ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, কর্তা-ভোক্তা বা অহঙ্কার বা কাঁচা

আমি নই—কারণ এ সকলই আমার জ্ঞেয়—সুতরাং আমা হইতে পৃথক্। ইহারা আমি নয়, আত্মা নয়, অনাত্মা। আমি বা আত্মা সম্বন্ধে ইহাই দ্বিতীয় বক্তব্য ; সে শুধু চৈতন্য মাত্র। যাহাকে আপাত-দৃষ্টিতে আমি বা আত্মা বলিয়া ভুল হইতে পারে, সেই অহঙ্কার বা কর্তা-ভোক্তা আমি বা কাঁচা আমি বা ক্ষুদ্র আমিটাও যে জ্ঞেয়, সুতরাং প্রকৃত আমি নয়, এবং তাহাকেও যে জানে সেই আমিটাই প্রকৃত আমি বা আত্মা, এই কথাটা সুস্পষ্টরূপে বুঝা ও সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। যে কখনও সুখী হয়, কখনও বা দুঃখী হয়—সে অবশ্যই জ্ঞেয়—নতুবা তাহার ঐ বিকার কি করিয়া লক্ষিত হয়? সুতরাং সে জ্ঞাতা নয়—আত্মা নয়।

প্রকৃত যে আমি সে এই "কাঁচা" আমিকেও জানে, ঠিক যেমন ঘট, পট ইত্যাদি আর সব কিছু জানে। সে নিজে সব কিছু জানে, কিন্তু তাহার আর অন্য জ্ঞাতা কেহ নাই। কর্তা ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা যে কাঁচা আমি বা অহঙ্কার তাহা যে প্রকৃত আমি নয়, কাঁচা আমির নিয়ত পরিবর্তনশীলতাও সে বিষয়ে অন্য প্রমাণ। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত শরীর ও মনের নানাবিধ পরিবর্তন সত্ত্বেও আমি যে সেই একই আমি, ইহা সকলেরই অনুভব এবং ইহাই আমির অর্থ বা লক্ষণ। শৈশবে যে আমি, যৌবনেও সেই আমি, বার্দ্ধক্যেও সেই আমি। সুখে যে আমি, দুঃখেও সেই আমি। প্রকৃত আমির কোনও পরিবর্তন নাই ; সে সব সময়ই এক। একথা অহঙ্কারের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, কারণ সে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল। জাগ্রতে এই অহঙ্কার বা কাঁচা আমিটা হয়তো দরিদ্র, দুঃখী, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ; স্বপ্নে সে হয়তো ধনী, সুখী ও আরামে শয়ান এবং সুষুপ্তিতে—অর্থাৎ স্বপ্নবিহীন সুনিদ্রায় সে একেবারেই নাই। প্রকৃত আমি বলিতে অবশ্যই এরূপ কিছু বুঝি না। যে সকল বিষয়ের, সকল ব্যাপারের—এমনকি এই কাঁচা আমির বা অহঙ্কারের যাবতীয় পরিবর্তনের—অধিককি, জাগ্রতে ও স্বপ্নে তাহার অস্তিত্বের

এবং সুষুপ্তিতে তাহার অভাবেরও সাক্ষী বা জ্ঞাতা, সেই নিত্য, অপরিবর্তনশীল, উদয়-অস্ত-বিহীন, সুখ-দুঃখের অতীত, আমিটাই প্রকৃত আমি।

(iii) প্রকৃত আমির বা আত্মার আকার, সীমা, গুণ, ক্রিয়া, বিকার ইত্যাদি বিষয়-ধর্ম কিছুই নাই ; সুতরাং তিনি অন্য বিষয়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বা মন দ্বারা বিষয়রূপে জ্ঞেয় নন। তাই বলিয়া তিনি যে শূন্য অর্থাৎ তাঁহার যে অস্তিত্বই নাই তাহা নয়। বিষয়সকল ইন্দ্রিয় বা মনদ্বারা গ্রাহ্য বলিয়া অজ্ঞ সাধারণের মনে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে কোনও কিছু থাকিতে হইলে তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে বা মনোগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু এ ধারণা যে ঠিক নহে তাহা অতি সাধারণ বিচার দ্বারাই বুঝা যায়। অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উপর নির্ভর করে না। এক খণ্ড কাষ্ঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, কাঠিন্য, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি আছে বলিয়া তাহা যতটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এক বোতল রংহীন, নির্মল, স্বচ্ছ জল ততটা নয়। এমনকি বোতলটি যদি জলে আগাগোড়া পরিপূর্ণ থাকে তবে জল মোটেই নাই বলিয়াই মনে হইতে পারে। বায়ুর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা আরও কম, কিন্তু অস্তিত্ব কিছু কম নহে। অন্ধকার রাত্রে অনুসন্ধানী বাতি (Head-light) জ্বালাইয়া মোটরে চলিবার কালে গাড়ীতে বসিয়া ঐ সন্ধানী বাতি সোজাসুজি দেখা যায় না। এমনকি সম্মুখে কিছু না থাকিলে ঐ বাতি জ্বলিতেছে কি না তাহাই বুঝা যায় না। তাই বলিয়া যে তাহার অস্তিত্ব নাই তাহা নয় ; সম্মুখে কিছু আসিলেই ঐ বাতির রশ্মি তাহার উপর পড়ে এবং ঐ বাতির অস্তিত্ব বুঝা যায়। হাতের টর্চ্‌লাইট্ সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। নিজের চক্ষুও দেখা যায় না—তাই বলিয়া যে উহা নাই তাহা নয়। যাহা দ্বারা অপর সকল কিছু দেখা যায় বা জানা যায় সে অবশ্যই আছে। এইরূপে যাঁহাদ্বারা সকল বিষয়ের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব জানা যায় সেই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অবশ্যই

আছেন। সর্বদা বিদ্যমান্ এই আত্মার অভাব কখনও হইতে পারে না। ইহার অভাব বা অনস্তিত্বের জ্ঞাতা যদি কেহ না থাকে—তবে ঐ অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই ; সুতরাং তাহার প্রশ্নই উঠে না। আর যদি ঐ অভাবের বা অনস্তিত্বের জ্ঞাতা বা সাক্ষী কেহ থাকেন তবে সেই সাক্ষী বা জ্ঞাতাই তো প্রকৃত জ্ঞাতা, আমি বা আত্মা! যাহার অভাব জ্ঞাত হইল, জ্ঞেয় বলিয়া সে অবশ্যই অন্য কিছু—যথা, অহঙ্কার—কিন্তু সে প্রকৃত আমি বা আত্মা নয়। আত্মা যে বিষয়ের অস্তিত্বেরই শুধু জ্ঞাতা তাহা নয়—তিনি কোনও বিষয়ের অনস্তিত্বেরও জ্ঞাতা। আত্মা ভিন্ন অপর কোনও জ্ঞাতা নাই। আত্মাই সকল বিষয় ও ব্যাপারের একমাত্র জ্ঞাতা বা সাক্ষী। আত্মাকে যদি শূন্য বলিয়া বলিতে বা ভাবিতে হয়—তবে ঐ শূন্যত্বের জ্ঞাতা বা সাক্ষী হিসাবেও ঐ আত্মাই থাকিয়া গেলেন। তাই বিষয় রূপে জ্ঞেয় না হইলেও আত্মার অভাব কখনও হয় না। আত্মা অবিনাশী। বস্তুতঃ আত্মাই একমাত্র বস্তু যাহা সত্য সত্যই সর্বদা বিদ্যমান্। বরঞ্চ, অন্যান্য বস্তুসকল, যাহারা ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা গ্রাহ্য বলিয়া জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হয় এবং সেজন্য যাহাদিগকে সত্য বা আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—তাহাদেরই কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। তাহারা আত্মার কল্পনাবিলাস মাত্র। ইহা একটু পরেই দেখান হইতেছে।

৩। (ক) এখন যে একটি সংশয় মনে উঠিতে পারে তাহা এই :—জানাও যখন একটি ক্রিয়া তখন জ্ঞাতা আত্মাও তো ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ বিকারী হইবেন। ইহার উত্তর এই যে, না, এ আশঙ্কা অমূলক। যে সক্রিয়ভাবে জানে সে প্রকৃত আমি বা আত্মা নয়—সে তো কাঁচা আমি বা অহঙ্কার। সে তো বিকারী বটেই। প্রকৃত যে আমি বা আত্মা সে এই ক্রিয়াশীল কাঁচা আমি বা অহঙ্কারের এবং তাহার ঐ জানা ব্যাপারেও জ্ঞাতা বা সাক্ষী। সাক্ষী যেন বিষয়-সকলের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুস্থলে থাকিয়া সব দিকের সব কিছু দেখেন,

জানেন; কিন্তু তাহার কেন্দ্রে আর কেহ থাকিতে পারে না, যে ভিতর হইতে তাহাকে দেখিবে বা জানিবে। অথবা তিনি যেন সকলের পিছনে থাকিয়া সম্মুখস্থ সব কিছু দেখেন, কিন্তু তাঁহার পিছনে আর কেহ নাই যে তাঁহাকে দেখিবে। সাক্ষীর আর অন্য দ্রষ্টা বা সাক্ষী নাই; তিনিই শেষ সাক্ষী। তাঁহার কোনও বিকার নাই—কেননা সে বিকারের জ্ঞাতা বা সাক্ষী কেহ নাই। প্রকৃত আমি জানিয়াও নিষ্ক্রিয় থাকেন, নির্বিকার থাকেন; জানিয়াও যেন জানেন না। এই ভাবটা বুঝাইবার জন্যই তাঁহাকে দ্রষ্টা বা সাক্ষী শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়। দ্রষ্টা বা সাক্ষীর এই নির্বিকার ভাবটি বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। মনে করুন একটি ফুটবল্ ম্যাচ্। সেখানে খেলোয়াড়রাও খেলাটি দেখে, অন্য দর্শকরাও তাহা তাহা দেখে—কিন্তু খেলোয়াড়গণ খেলার ফলাফলে যেরূপ জড়াইয়া পড়ে, অন্য দর্শকেরা সেরূপ পড়ে না। দর্শকদিগের মধ্যেও আবার যাহারা কোনও পক্ষের সমর্থক তাহারাও খেলার ফলাফলে জড়াইয়া পড়িয়া তাহাতে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে—উত্তেজিত বা বিমর্ষিত হয়। কিন্তু মাঠে যদি এমন কোনও দর্শক থাকেন যিনি কোনও পক্ষেরই সমর্থক নন, যিনি খেলাটিকে, দুপক্ষের খেলোয়াড়দিগকে এবং তাহাদের সমর্থক দর্শকগণের সমস্ত কাণ্ডকারখানা, ভাব, ভঙ্গী ইত্যাদি নির্বিকারভাবে দেখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টার বা সাক্ষীর উপমাস্থল। তিনি দেখেন, কিন্তু অন্যদের মত নয়। অন্যদের মত তিনি উত্তেজিত বা বিষাদগ্রস্ত হন না। খেলা না দেখিলেও তিনি যেমন শান্ত—দেখিয়াও সেইরূপ শান্ত, নির্বিকার থাকেন। অর্থাৎ, যেন দেখেন অথচ দেখেন না—অনেকটা এই ভাব। খেলোয়াড়গণ ও তাহাদিগের সমর্থকগণের সহিত এই নিরপেক্ষ, নিস্পৃহ দর্শকের যে প্রভেদ, অহঙ্কার বা কাঁচা আমির সহিত প্রকৃত আমি বা সাক্ষীর বা আত্মারও সেই প্রভেদ।

(খ) অবশ্য এ কথা প্রাথমিকভাবে স্বীকার্য যে নিস্পৃহ হইলেও,

জানা ক্রিয়া দ্বারাই জ্ঞাতার কিছু না কিছু কর্তৃত্ব বা বিকারিত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু নিস্পৃহতার বা উদাসীনতার বৃদ্ধির সহিত উহা কমিতে বাধ্য এবং অনাসক্তির বা উদাসীনতার চরম সীমায় ঐ বিকারও শূন্যে পর্যবসিত হয়। তখন অবশ্য জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বও থাকে না; তিনি তখন শুদ্ধ চৈতন্যে পর্যবসিত হন। কিন্তু এইটাই জ্ঞাতা, দ্রষ্টা বা সাক্ষীর প্রকৃত অর্থ বা লক্ষ্যার্থ। দৃষ্টান্ত ঃ—ঘূর্ণায়মান চক্রের সকল অংশই সবল, কিন্তু যতই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই গতিবেগ কমিতে থাকে এবং ঠিক ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছুলে, সেখানে আর কোনও গতিবেগই নাই। কেন্দ্রবিন্দুটি সচল চক্রে অবস্থিত হইয়াও সম্পূর্ণ নিশ্চল। অথবা, যেমন পুরোহিত মহাশয় গঙ্গাস্নান করেন, পূজা করেন, আরতি করেন, শাস্ত্রপাঠ করেন, ভজন করেন, ইত্যাদি। এ সকলের দ্বারাই তাঁহাকে প্রথম চেনা যায়। কিন্তু চিনিবার পর, তিনি যখন এ সকলের কিছুই না করিয়া শান্তভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকেন, তখনও যেমন তাহাকে পুরোহিত মহাশয়ই বলিতে হয় এবং সেইটাই যেমন তাহার স্বকীয় রূপ—অনেকটা সেই রকম। কিন্তু শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা কোনও কিছুর স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বুঝান যায় না। গোলাপফুল যে না দেখিয়াছে, শত বর্ণনা বা তুলনা দ্বারাও তাহাকে গোলাপ ফুলের স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝান যায় না। কোনও জিনিষ ঠিক ঠিক জানিতে হইলে তাহাকে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ করিতে হয়। একথা সাধারণ স্থূল বিষয়ের ক্ষেত্রেই যখন প্রযোজ্য, তখন আত্মার বেলায় তো কথাই নাই কারণ আত্মা কোনও বিষয় নয়; আত্মা অবিষয়; তাহার কোনও তুলনাও নাই। যুক্তি বা বিচার দ্বারা কোনও কিছুর সঠিক ও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না। যুক্তি ও বিচার শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষীভূত কোনও সত্যে, উপনীত করাইয়া জ্ঞান উৎপন্ন করে মাত্র। গণিতের জটিল প্রক্রিয়াসকলও শেষ পর্যন্ত অতি সরল প্রত্যক্ষীভূত কোনও সত্যের (স্বতঃসিদ্ধ বা axom এর) আশ্রয় গ্রহণ করে। আত্মাকেও

শুধু যুক্তি বা বিচারের দ্বারা জানা যায় না। তবে শাস্ত্রসম্মত যুক্তি বা বিচার আত্মাকে প্রত্যক্ষীকরণের ব্যাপারে সহায়ক হয়। বিচারের সাহায্যে জানা যায় যে আত্মাই প্রকৃত জ্ঞাতা এবং সেই কারণে জ্ঞেয় নন। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার কালে এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখিয়া নামরূপ বিশিষ্ট যাহা কিছু মনে উদয় হইবে তাহাকে জ্ঞেয় বুঝিয়া—অর্থাৎ উহা জ্ঞাতা আত্মা নয় ইহা জানিয়া—ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে, সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া মন হইতে সকল প্রকার নামরূপযুক্ত বিষয়—যথা বাহ্যজগৎ, দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি বর্জিত হইলে যে নামরূপবিহীন শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। এইরূপে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জানা যায়। এ বিষয়ে পরে আরও বলা হইবে।

৪। এবারে আমরা প্রকৃত আমিকে বা আত্মাকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ হইতে অবলোকন করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের নিকট নানা প্রকার বিষয় প্রিয় বলিয়া বোধহয়—কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, কোনও বিষয়ই তাহার নিজের খাতিরেই আমাদের প্রিয় হয় না। অর্থাৎ তাহার প্রিয়ত্ব তাহার নিজস্ব নয়। যে বস্তু দ্বারা আমার যতখানি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সে বস্তু ততটুকু প্রিয় হয়। যে আহার্য ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমার প্রিয় মনে হইয়াছিল—ক্ষুধা নিবৃত্তির পর আর তাহা তত প্রিয় মনে হয় না। এমনকি, উদরপূর্তির পর আর এক প্রস্থ খাদ্য যদি আমাকে খাইতে বাধ্য করা হয় তবে তাহা আমার নিকট অত্যন্ত অপ্রিয়রূপেই প্রতিভাত হইবে। ক্ষুধার সময় যে খাদ্য আমার অতি প্রিয় ছিল, ঠিক সেই একই খাদ্য যখন ক্ষুধা নিবৃত্তির পর অপ্রিয় মনে হয়, তখন খাদ্যের যে প্রিয়ত্ব তাহা নিশ্চয়ই তাহার নিজস্ব নয় বুঝিতে হইবে কারণ তাহা যদি হইত তবে একই খাদ্য সর্বদা একই রকম প্রিয় বোধ হইত। অন্যান্য প্রিয় বস্তুর সম্বন্ধেও যে একথা প্রযোজ্য তাহাও বুঝা যায়। অর্থাৎ প্রিয়ত্ব কোনও বিষয়েতে নিহিত নাই; যে বস্তু

যখন ও যতটা আমার প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক হয় তখন তাহা ততটা আমার প্রিয় মনে হয়। যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয়, সে আমার শত্রুর নিকট অপ্রিয়। আবার সেই একই ব্যক্তি যদি আমার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে, তবে তাহার নিকট প্রিয় হইবে এবং আমার অপ্রিয় হইবে। স্বামীর নিকট যে স্ত্রী প্রিয় মনে হয় তাহা স্বামীর নিজেরই প্রয়োজনে এবং স্ত্রীর নিকট যে স্বামী প্রিয় মনে হয় তাহাও স্ত্রীর নিজেরই প্রয়োজনে। অর্থাৎ আমার মুখ্য বা প্রকৃত প্রিয় আমি নিজে। এই জন্যই যে বিষয়টি আমার যত নিকট, সে তত প্রিয় মনে হয়। অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র অপেক্ষা এই পৃথিবী আমার নিকট অধিক প্রিয়; পৃথিবীর মধ্যেও, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমার দেশ অধিক প্রিয়; আমার দেশের মধ্যে আমার সমাজ এবং তাহার মধ্যে আমার পরিবারবর্গ অধিক প্রিয়; পরিবারবর্গের মধ্যেও আমি নিজে প্রিয়তম। নিজের মধ্যেও দেহ অপেক্ষা প্রাণ আমার অর্থাৎ আত্মার নিকটতর বলিয়া প্রিয়তর; এক বা একাধিক অঙ্গ বিসর্জন দিয়াও যদি প্রাণ রক্ষা হয় তবে লোকে তাহাই চায়। প্রাণ অপেক্ষা মন আমার অর্থাৎ আত্মার আরও সন্নিকট তাই অধিক প্রিয়; মনস্তুষ্টির জন্য অনেকে প্রাণও বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক হন। মন অপেক্ষাও কিন্তু আত্মা আরও অধিক প্রিয়—তাই যোগীরা মনোনিগ্রহ করিয়া আত্মানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। উপযুক্ত অভ্যাস দ্বারা পাঠক নিজেও ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আত্মার অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কিছুই নাই; আত্মাই প্রিয়তম। প্রকৃতপক্ষে আত্মাই একমাত্র প্রিয় বস্তু; অন্য বস্তু তাঁহারই সান্নিধ্যে ও প্রতিফলনে সময় ও অবস্থা-বিশেষে প্রিয় মনে হয় মাত্র। যথা, পুত্রের কোনও বন্ধু যদি পুত্রের উপকার করে তবে সেও আমার প্রিয় হয়, কিন্তু মুখ্য বা প্রকৃত প্রিয় আমার পুত্রই। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, যে বস্তু "আমির" যত নিকটে, যাহাতে যতখানি "আমিত্বে"র সান্নিধ্য বা প্রতিফলন, সে তত প্রিয়। "আমিত্বে"র মানদণ্ড দিয়াই প্রিয়ত্ব নির্দ্ধারিত হয়। প্রিয় বলিয়া

আলাদা কিছু নাই ; "আমি"টাই একমাত্র প্রিয় বস্তু এবং আমি বলিতে আত্মাকেই বুঝায়। সমাধি বা সুষুপ্তিকালে বাহ্যজগৎ, দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার এ সব কিছুরই অভাব হয় ; কিন্তু সেজন্য আমাদের বিন্দুমাত্র দুঃখ হয় না। তাহারা যদি প্রিয় হইত, তবে তাহাদের অভাবে অবশ্যই দুঃখ হইত। তাহা যখন হয় না তখন এ সকলে প্রিয়ত্ব নাই ; আত্মাই একমাত্র প্রিয় বস্তু।

৫। (ক) প্রিয় শব্দের অর্থ যাহা আমার ভাল লাগে ; অর্থাৎ, যাহা হইতে আমি আনন্দ পাই ; অর্থাৎ, যাহা আমাকে আনন্দ দান করে। আত্মাই যখন মুখ্য বা মূল প্রিয় বস্তু, তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মাই আনন্দের মুখ্য দাতা—আনন্দের মূল উৎস। সুতরাং আত্মাতে অবশ্যই আনন্দ আছে। আত্মা কিন্তু সম্পূর্ণ সমরস ; তাঁহাতে কোনও অংশ বা দেশ-বিশেষ নাই। সুতরাং আনন্দ আত্মার কোনও অংশে বা দেশবিশেষে নাই—অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণভাবে আনন্দময়—আনন্দস্বরূপ। এবং আত্মা ভিন্ন আনন্দের অপর কোনও উৎস নাই।

(খ) ইহাও সুবিদিত যে, নিজের মৃত্যু বা ধ্বংস কেহই চাহে না। এমনকি, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, সেও প্রকৃতপক্ষে নিজের ধ্বংস চায় না ; বর্তমান দুঃখময় পরিস্থিতির অবসানই তাহার কাম্য। আমি যেন চিরস্থায়ী হই, অমর হই—এটা সকলেরই কাম্য। আত্মা যদি আনন্দময় না হইত তবে তাহার স্থায়িত্ব কেহ যাচ্ঞা করিত না। আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই লোকের কাম্য নয়। ইহা দ্বারাও আত্মার আনন্দস্বরূপতা প্রতিপন্ন হয়।

৬। উপরোক্ত বিচারে আত্মার আনন্দ-স্বরূপতা বিষয়ে যুক্তি দ্বারা (theoretically) যাহা প্রতিপন্ন করা হইল—তাহা পরীক্ষার দ্বারা (practical test দ্বারা) প্রত্যক্ষভাবেও নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু কোনও বস্তুর স্বরূপ পরীক্ষার দ্বারা (practical test দ্বারা) নির্ণয় করিতে হইলে—তাহার সহিত মিশ্রিত অন্য বস্তু হইতে পৃথক করিয়া তবে তাহাকে পরীক্ষা করিতে হয়—ইহাই সরল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

চিনির সহিত যদি বালুকা মিশ্রিত থাকে তবে চিনির স্বরূপ পরীক্ষা করিবার পূর্বে তাহাকে বালুকামুক্ত করিতে হয়। এই নিয়ম অনুসারে, আত্মার স্বরূপ যথাযথরূপে পরীক্ষা করিতে হইলে, তাঁহার সহিত মিশ্রিত অনাত্মবস্তুসকল হইতে তাঁহাকে পৃথক করা আবশ্যক। জাগরণে বা স্বপ্নে, আত্মা, অর্থাৎ বিজ্ঞাতা নানা প্রকার জ্ঞেয় বিষয়—অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর সহিত মিশ্রিত বা জড়িত থাকেন। তাই তখন তাঁহার স্বরূপ কি তাহা সঠিক বুঝা দুষ্কর হয়। কিন্তু সমাধি বা সুষুপ্তিকালে জ্ঞেয় অর্থাৎ অনাত্ম বিষয় কিছু থাকে না—তখন আত্মা একাই থাকেন। সুতরাং আত্মার স্বরূপ কি—তাঁহা আনন্দস্বরূপ কিনা—তাহা পরীক্ষার দ্বারা জানিতে হইলে, সমাধিকালে বা সুষুপ্তি-কালেই তাহা কর্তব্য। সমাধিকালের অবস্থা অনেকেরই অজ্ঞাত—কিন্তু সুষুপ্তিকালের অবস্থা অনুধাবন করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব।

৭। (ক) সুষুপ্তিকালে আত্মাকে পরীক্ষা করিবার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন মনে উঠিতে পারে যে তখন আত্মা থাকেন তো? অন্যান্য বিষয়ের অভাবের সহিত তখন আত্মারও অভাব হয় না তো? ইহার উত্তর এই যে, না, তখনও জ্ঞানস্বরূপ, সাক্ষীস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান্ থাকেন। তাহা না হইলে, আমি যে সুষুপ্ত ছিলাম, তখন কিছুই জানিতে পারি নাই—এবং তখন যে বেশ আনন্দে ছিলাম—জাগিয়া উঠিয়া এ সকল ব্যাপারের স্মৃতি হইত না। যে হেতু সুষুপ্তিকালে আমি ভোগ্য বিষয়ের অভাব এবং আনন্দের প্রাচুর্য জানিয়াছিলাম—সেই হেতু তখন আমি অবশ্যই ছিলাম। তখন যে কিছু জানা যায় নাই, জ্ঞেয়বিষয়ের অভাবই তাহার কারণ; জ্ঞাতার অভাব তখনও ছিল না। গভীর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার অন্ধকারে বিশেষ সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও যে কিছু দেখা যায় না, দৃশ্যের অভাবই তাহার কারণ—দ্রষ্টার অভাব নয়। আলোকদর্শনকারী যেরূপ দ্রষ্টা, অন্ধকারদর্শনকারীও সেইরূপ দ্রষ্টাই। টেবিলের উপর বইখানি

থাকিলে তাহার দর্শনকারী যেমন দ্রষ্টা, বইখানি যখন থাকে না, তখন উহার অভাব যে দেখে বা জানে সেও তেমনি দ্রষ্টা বা জ্ঞাতাই। সেইরূপ সুষুপ্তিতেও দ্রষ্টা আত্মা থাকেন এবং বিষয়ের অভাব দর্শন করেন। তখন যে বিষয় ছিল না—তাহার সাক্ষী তো তিনিই।

(খ) সুষুপ্তির প্রসঙ্গে আরও যে একটি কথার সমর্থন পাওয়া যায় তাহা এই যে দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার—এরা কেহই প্রকৃত আমি নয়। যে প্রকৃত আমি, সে কখনও আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সুষুপ্তিকালে, দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার—এরা কেহই আমাতে থাকে না। বাহ্যজগৎ ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত এরাও সব আত্মাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাই এরা সব আগন্তুক; এরা কেউ আমি নয়। জামা, কাপড়ের ন্যায় এরা কখনও (অর্থাৎ জাগ্রতে বা স্বপ্নে) আমাতে থাকে আবার কখনও (অর্থাৎ সুষুপ্তিতে বা সমাধিতে) আমাতে থাকে না। যাহা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আমাতে থাকে না তাহা কখনই প্রকৃত আমি হইতে পারে না।

(গ) সুষুপ্তিকালেও কিন্তু আত্মা সম্পূর্ণ নিরাবরণ হন না, কারণ তখনও তাঁহাতে অজ্ঞানরূপ উপাধি বা আবরণ থাকে। তখন জাগ্রৎকালের বা স্বপ্নাবস্থার তুল্য দৃশ্যাদির অনুভব কিছু না থাকিলেও "আমি কিছু জানিতেছি না"—এইরূপ অজ্ঞানের অনুভব থাকে। কিন্তু আত্মার আরও একটি অবস্থা আছে—যাহাকে তুরীয় বলা হয়। সেখানে অজ্ঞানরূপ আবরণও থাকে না। তখন আত্মার শুদ্ধ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপতারই মাত্র অনুভব হয়। যোগীরা বা জ্ঞানীরা সমাধিকালে এই অবস্থায় থাকেন। সাধারণ পাঠক ইহা আপাততঃ অনুমান করিয়া লইবেন; পরে, জ্ঞানোদয়ে ইহার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

৮। যাহা হউক, আমরা এখন আমাদের পূর্বপ্রসঙ্গে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আত্মার স্বরূপ কি এই বিষয়ে ফিরিয়া যাই। তখন একা থাকিয়াও আনন্দেই ছিলেন—ভোগ্য বিষয়ের অভাবে তাঁহার

আনন্দের অভাব হয় নাই, ইহা সুষুপ্ত পুরুষ জাগিয়া উঠিয়া সুষুপ্তি-কালের স্মৃতি হইতে জানিতে পারেন। আরও দেখা যায় যে কোনও সুষুপ্ত পুরুষকে জাগাইতে গেলে তিনি খুশী না হইয়া বিরক্ত হন। তখন বিষয়ভোগরহিত হইয়াও তিনি যদি আনন্দে না থাকিতেন তখন ঐ অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইবার চেষ্টায় তিনি বিরক্ত হইতেন না। আবার ইহাও সকলেই জানেন যে সুনিদ্রা উপভোগের জন্য লোকে কত যত্নই না করে—কোমল শয্যা রচনা, কোলাহল-বিহীন—এমনকি সঙ্গীতও শুনা না যায় এমন স্থান নির্বাচন, ইত্যাদি। সুষুপ্তি আনন্দের অবস্থা না হইলে লোকে তাহার জন্য এত সব করিত না। সুষুপ্তিকালে আত্মাকে পরীক্ষা করিয়া তাহা যে আনন্দময় ইহাই প্রতিপন্ন হইল। বস্তুতঃ, নামরূপাত্মক কোনও বিষয়ের চিন্তা না করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে সমাহিত হইলে, অর্থাৎ তাঁহাতেই একাগ্রচিত্ত হইলে তাঁহার আনন্দস্বরূপতা প্রত্যক্ষীভূত হয়—ইহার জন্য আর কোনও বিচারের প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ অজ্ঞানাবরণ না থাকায় সমাধিকালেই আত্মার আনন্দস্বরূপতার সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

৯। ইহা হইতে বুঝা গেল যে আত্মা নিজেই আনন্দময়; আনন্দ বাহির হইতে, অন্য বিষয় হইতে আসে না; আনন্দ আত্মার স্বরূপই। যেহেতু আমি কখনও আমি-বিহীন অর্থাৎ আত্মা-বিহীন হইতে পারি না, সেই হেতু আমি কখনও আনন্দবিহীনও হইতে পারি না। আনন্দের অভাব প্রকৃতপক্ষে কখনও হয় না। জাগ্রতে বা স্বপ্নকালে মন অন্য নানা বিষয়ে লিপ্ত থাকাতে আত্মার আনন্দ বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অন্যান্য অনুভূতিতে চাপা পড়ে—তাই এই ব্যাপারটা আমাদের লক্ষ্যে আসে না। বিখ্যাত পঞ্চদশী নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। অনেকগুলি বালক যখন একই সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়নরত—তখন বালকবিশেষের পিতা তাহার নিজ পুত্রের কণ্ঠস্বর শ্রবণ-

জনিত আনন্দ অনুভব করিতে পারেন না। অন্য বালকেরা যদি স্তব্ধ হয়, তবেই তিনি তাহা করিতে সক্ষম হন। যোগীরা তাই যোগসহায়ে অন্যান্য বিষয়ের অনুভব স্তব্ধ করিয়া সমাধিতে আত্মানন্দ অনুভব করেন। জ্ঞানীরা বিচার-সহায়ে তথাকথিত অনাত্মবস্তুসকলও যে প্রকৃতপক্ষে আত্মাই—এইরূপ সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হন এবং অতঃপর সর্বদা, সর্বাবস্থায়, সর্বত্র শুদ্ধ আত্মাকেই দর্শন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দে অবস্থান করেন। এ বিষয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

১০। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আত্মাই যদি একমাত্র প্রেমাস্পদ বস্তু, অর্থাৎ আনন্দের একমাত্র উৎস, তবে অন্য বিষয়ের ভোগ হইতে যে সুখলাভ হইতে দেখা যায়, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই যে, বিষয় হইতেই যে সুখ বা আনন্দ আসে প্রকৃত ব্যাপারটি সেরূপ নয়। আমাদের মনে অসংখ্য বিষয়-বাসনা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। ঐ সকল বাসনা দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া লোকে সর্বদাই দুঃখ বা আনন্দের অভাব বোধ করে—কারণ ঐ বিক্ষিপ্ত মনে আত্মানন্দের প্রতিফলন ভাল হয় না। ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তিতে মনের ঐ বাসনাজনিত বিক্ষেপ সাময়িকভাবে শান্ত হয়; তখন তাহাতে আত্মানন্দের অধিক প্রতিফলন হয় ও লোক আনন্দ পায়। আনন্দ তখনও অন্তর—অর্থাৎ আত্মা হইতেই আসে—বাহির হইতে বা বিষয় হইতে নয়।

১১। পূর্বোক্ত আলোচনায় জানা গেল যে প্রকৃত আমি বা আত্মা বলিয়া একটি বস্তু সর্বদাই বিদ্যমান্ আছেন। তিনিই সকল বিষয়ের জ্ঞাতা; সুতরাং তিনি চেতন, অর্থাৎ তাঁহাতে চৈতন্য আছে। আবার, যেহেতু তিনি জ্ঞাতা সেই হেতু তিনি জ্ঞেয় নন; সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ নাম-রূপ-বিহীন। অর্থাৎ তিনি অসীম, অনন্ত, নিরাকার নির্বিকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আর আমরা দেখিয়াছি যে তিনি আনন্দস্বরূপও বটেন। আমরা প্রথমেই

দেখিয়াছি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মা এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় এবং এই দুইটির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলেই সব কিছু জানা হয়। এ দুইটির মধ্যে প্রথমটির, অর্থাৎ জ্ঞাতার বা আত্মার সম্বন্ধে প্রায় সব কিছুই জানা হইল। প্রায়, এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জ্ঞাতা বা আত্মার সহিত জ্ঞেয় বা অনাত্মবস্তুর সম্বন্ধ কি, আত্মার সম্বন্ধে এই বিচারটুকু এখনও বাকী। তাহার পূর্বে আমাদের দ্বিতীয় বস্তুটির, অর্থাৎ জ্ঞেয় বা অনাত্মবস্তুর স্বরূপ কি তাহা জানা আবশ্যক। সুতরাং এখন আমরা জ্ঞেয় বা অনাত্মবস্তুর স্বরূপ কি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১২। জ্ঞেয় বস্তুকে দৃশ্যও বলা হয়। বলা বাহুল্য যে এ স্থলে দৃশ্য শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে—অর্থাৎ, শুধু চক্ষু দ্বারা গ্রাহ্য বিষয় নয়, যাহা কিছু যে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা বা ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি যে মন—সেই মন দ্বারা গ্রাহ্য, তাহাকেই দৃশ্য বলা হয়।

১৩। (ক) প্রথমে তথাকথিত বাহ্যবিষয়সকল—অর্থাৎ যাহারা আমার স্থূল দেহের বাহিরে অবস্থিত তাহাদিগের কথাই ধরা যাউক। এখানে আদিতেই বলা প্রয়োজন যে "আমি আছি" এটি যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য, ইহার যেরূপ কোনও কারণান্তর বা প্রমাণের অপেক্ষা নাই, বাহ্যবিষয়ের অস্তিত্ব কিন্তু সেরূপ স্বতঃসিদ্ধ নয়। সাধারণের মনে একটি বদ্ধ ধারণা এই যে বাহ্যবিষয় সকল অবশ্যই আছে এবং সেইজন্যই তাহাদের জ্ঞান হয়। প্রকৃত ব্যাপারটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কোনও একটি বাহ্য বিষয় যে আছে একথা বলিবার বা মনে করিবার

একটা কারণ থাকে ; উহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় যে বাহ্য জগৎ আছে একথা তুমি মনে কর কেন ; তাহার কারণ কি ? তবে সে এ প্রশ্নটিকে অবান্তর বলিবে না। সে বলিবে—কেন, জগৎ দেখা যায়, শোনা যায়, স্পর্শ করা যায় ইত্যাদি—অর্থাৎ জগতের জ্ঞান হয় ; তাই বলি জগৎ আছে ; শুধু শুধু বা অকারণে নয়। অর্থাৎ বাহ্য জগতের জ্ঞান হয় বলিয়াই আমরা মনে করি যে বাহ্য জগৎ আছে ; কোনও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান যদি না হইত তবে বাহ্য জগৎ আছে একথা আমরা বলিতাম না। এখন, বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়াই বাহ্য জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব সত্যসত্যই প্রমাণিত হয় কি না, তাহাই বিচার্য। তজ্জন্য বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বলিতে কি বুঝায় অর্থাৎ ঐ জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা বুঝা আবশ্যক। আপাততঃ, বাহ্যবিষয়সকল আছে ইহা ধরিয়া লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

(খ) কোনও বাহ্য বিষয়বিশেষ শুধু "আছে" এই কারণেই যদি তাহার জ্ঞান হইত—তবে নিকটস্থ বা দূরস্থ, এদেশস্থ বা বিদেশস্থ, এ পৃথিবীর যেখানেই থাকুক বা অন্য কোনও গ্রহ, নক্ষত্রে অবস্থিত হউক—যেখানে যাহা কিছু আছে ; ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক—বাহ্য সকল বস্তুই যুগপৎ আমার জ্ঞেয় হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না ; হইতে পারেও না। কিন্তু কেন ? ইহার কারণ কি ? কারণ এই যে শুধু থাকার দরুণ কোনও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয় না। যখন উহা আমার চক্ষু, কর্ণাদি কোনো বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিয়া উহাতে কোনও প্রকার স্পন্দন সৃষ্টি করে তখনই মাত্র উহার জ্ঞান হয়। কিন্তু এই কালে আমার প্রত্যক্ষ হয় কোন্ জিনিষটি ? আমার ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন না আমার দেহের বাহিরে অবস্থিত বস্তুটি ? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে যাহা আমি প্রত্যক্ষ করি তাহা ঐ ইন্দ্রিয়স্পন্দন ; আমার দেহের বাহিরে অবস্থিত কোন কিছু প্রত্যক্ষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আমার

ইন্দ্রিয়স্পন্দনকেই মাত্র প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারি এবং উহা দ্বারাই বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকি। এই অনুমান কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে ; বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যক্ষীভূত ইন্দ্রিয়স্পন্দনকেই আমি বাহ্য বিষয় বলিয়া আখ্যা দেই। আমার বাহিরের কিছু আমার পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কথাটি অতীব সরল—কিন্তু ইহার মর্ম এতই গভীর ও সুদূরপ্রসারী যে পাঠকের এ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহাই অদ্বৈতবিচারের মূল ভিত্তি। সুতরাং এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত সহকারে আরও কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যদিও অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে তাহা নিষ্প্রয়োজন মনে হওয়াই সম্ভব।

১৪। (ক) (i) সকলেই এই প্রবাদবাক্যটি জানেন যে "A wearer knows best where the shoe pinches." অর্থাৎ, যাঁহার পায়ে জুতা, শুধু তিনিই ঠিক ঠিক জানেন যে জুতার কাঁটা কোথায় ফুটিতেছে। কিন্তু কেন? আমি যদি সেই ব্যক্তি না হই, তবে আমি কেন তাহা জানিতে পারি না? উত্তর ঐ একই—"আমার দেহের বাহিরের কিছু আমার পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।" বাহ্য বিষয় থাকিলেও তাহা আমি জানিতে পারি না—যদি না আমাতে তজ্জনিত ইন্দ্রিয়-স্পন্দন হয়।

(ii) একটি দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ডের একপ্রান্ত জ্বলিতে থাকিলেও তাহার অপর প্রান্ত আমি ধরিয়া থাকিতে পারি—তাহাতে আমার হাতে তাপ অনুভব হয় না। ইহার কারণ কি? জ্বলন্ত দিকটাও তো আছে—তথাপি কেন তাপ অনুভূত হয় না? উত্তর ঐ একই—আমার দেহের বাহিরের কিছু আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কাষ্ঠখণ্ডের জ্বলন্ত দিকটা আমার দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়—উহা আমার ইন্দ্রিয় স্পন্দিত করে না—তাই তাহার অনুভবও হয় না। আমার ইন্দ্রিয় স্পন্দিত না হইলে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয় না।

(খ) (i) অপরপক্ষে, বাহ্যবস্তু বাস্তবিক না থাকিলেও তাহার জ্ঞান হইতে পারে, যদি উপযুক্তপ্রকার ইন্দ্রিয় স্পন্দন হয়। আমরা

হয়তো এমন কোনও নক্ষত্র এখন দেখিয়া থাকি যাহা বহু শতাদি-পূর্বেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যখন ছিল, তখন তাহা হইতে যে সকল আলোকরশ্মি নির্গত হইয়াছিল, দূরত্বহেতু তাহারাই এতদিনে আমাদের চক্ষুতে পড়িয়া অক্ষিপটে (retinaতে) স্পন্দন সৃষ্টি করিতেছে এবং উক্ত তারকাটির অস্তিত্বের মিথ্যা প্রতীতি করাইতেছে। তারকাটির অস্তিত্বের প্রতীতির জন্য অক্ষিপটের স্পন্দনবিশেষই যথেষ্ট—তজ্জন্য তারকাটির সত্যসত্যই থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

(ii) এখন না থাকুক, পূর্বে কখনও অবশ্যই ছিল, তাই জিনিষটির জ্ঞান হইতেছে—একথাও বলা চলে না। কারণ, যেমন, অন্ধকার ঘরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চোখের পাতা যদি সজোরে রগড়ান যায়, তবে উজ্জ্বল আলোকপুঞ্জ দেখা যাইবে—ঠিক যেমন বাহিরের আলোকপুঞ্জ দেখা যায়। রগড়ান বন্ধ করিবার পরও কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপ আলোক দেখা যায়—যতক্ষণ পর্যন্ত চক্ষুর পর্দার (retina-র) স্পন্দন থাকে। অর্থাৎ, বাহিরে আলোক বাস্তবিক না থাকিলেও তাহা দেখা যাইতে পারে। অক্ষিপটের স্পন্দন হইলেই আলোকদর্শন হয়—তজ্জন্য বাস্তবিক আলোক থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। স্বপ্নে যে আলোক দর্শন হয় এবং যে আলোকের দ্বারা স্বপ্নের অন্যান্য বস্তু প্রকাশিত হয়—তজ্জন্য বাহ্য আলোকের ত নয়ই—এমনকি অক্ষিপট স্পন্দনেরও অপেক্ষা নাই—চিত্ত স্পন্দনই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ধ্যানাভ্যাসের ফলে অনেক সময় যে জ্যোতিঃ-দর্শন হয়—কখনও বা স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের ন্যায়, কখনও বা উজ্জ্বল মেঘপুঞ্জের ন্যায়—কখনও বা হীরকাদি হইতে বিচ্ছুরিত কিরণের ন্যায়—তাহাও বাহির হইতে আসে না।

(iii) চোখে বালি ঢুকিলে তাহা বাহির হইবার পরও অনেক-ক্ষণ পর্যন্ত মনে হয় যেন চোখে বালি এখনও আছে। গলায় বিদ্ধ মাছের কাঁটা বাহির হইবার পরেও মনে হইতে থাকে যেন কাঁটা এখনও আছে। স্নায়ুর স্পন্দন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বালির বা

কাঁটার অনুভব হয়; তজ্জন্য বালি বা কাঁটা সত্যসত্যই থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। শুধু তাহাই নয়, চোখে এমন অসুখও হয় যাহাতে মনে হয় যেন চোখে বালি ঢুকিয়াছে এবং গলায়ও এমন অসুখ করিতে পারে যাহাতে মনে হয় যে গলায় কিছু ফুটিয়াছে।

(iv) কানের মধ্যেও অনেক সময় অনেকপ্রকার শব্দ শুনা যায়, যাহা মনে হয় যেন বাহির হইতে আসিতেছে—কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহা নয়। নির্জন, নীরব স্থানে, কেহ অঙ্গুলী দ্বারা কানের ছিদ্রদ্বয় দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া একাগ্রমনে লক্ষ্য করিলে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। ধ্যানাভ্যাসের ফলে অনেক সময় যে নানারূপ ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়—যথা, দূরে অবস্থিত মন্দির বা গির্জার ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ—তাহাও সত্যই কোনও মন্দির বা গির্জা হইতে আসে না।

(v) অনেক সময় (অসুস্থ অবস্থায়) গায়ের নানা স্থানে এমনিতেই জ্বালা করে—অথচ মনে হয় যেন সেখানে কেহ লঙ্কাবাটা বা ঐরূপ কিছু লাগাইয়া দিয়াছে। অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। এ সকল হইতে বুঝা যায় যে, (ক) বাহ্য বিষয় থাকিলেও তাহার জ্ঞান হয় না, যদি না কোনও বাহ্যেন্দ্রিয় স্পন্দিত হয়; এবং (খ) অপরপক্ষে, শুধু বাহ্যেন্দ্রিয়স্পন্দন হইলেই বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান হয়, যদি সেই বাহ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে নাও থাকে। অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান শুধু বাহ্যেন্দ্রিয়স্পন্দনের উপরই নির্ভর করে। ইন্দ্রিয়স্পন্দন হইলেই বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়; না হইলে হয় না। ইহার সহিত বাহ্য বিষয়ের থাকা বা না থাকার কোনও সম্পর্ক নাই। ইন্দ্রিয়ে যে স্পন্দন হয় তাহাই মাত্র আমি প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারি। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন প্রকার স্পন্দনকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা-দিগকেই বিভিন্ন বাহ্য বিষয় বলিয়া নামকরণ করি। কোনও বাহ্য বিষয়ই, পূর্বে—এ জন্মে বা পূর্ব কোনও জন্মেও—কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই; এখনও করি না; পরেও কখনও করিব না—কারণ

তাহা সম্ভব নয়। যাহাই আমার বাহিরে তাহাই আমার নিকট অপ্রত্যক্ষ, অজ্ঞাত।

(গ) বাহ্য জগৎ আছে ইহা ধরিয়া লইয়াই আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু বিচারে তাহা টিকিল না। আমরা ১৩(ক) সংখ্যক অনুচ্ছেদে দেখিয়াছি যে বাহ্য জগৎ আছে এ কথা মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়। কিন্তু বিচার করিয়া যখন দেখা গেল যে সেই তথাকথিত বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় স্পন্দনের জ্ঞান মাত্র, তখন বাহ্য জগৎ বলিয়া যে কিছু আছে একথা মনে করিবার আর কোন কারণ থাকিল না। অর্থাৎ বাহ্য জগৎ বলিয়া কিছু কখনও ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না। বাহ্য জগৎ বলিয়া যাহা সাধারণে পরিচিত তাহা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় স্পন্দন মাত্র। ইন্দ্রিয় স্পন্দনের কারণ হিসাবেও বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয়। চিত্তস্পন্দনের কারণ যে বাহ্য বিষয় নয়, সে বিষয়ে নিম্নোক্ত ১৮(ক) অনুচ্ছেদের যুক্তি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৫। (ক) বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্পন্দনের নামই যদি বাহ্য বিষয় হয়, তবে চক্ষু যখন সম্মুখে একটি গোলাপ ফুলের প্রতীতি করায় তখন নাসিকাও গোলাপেরই গন্ধ অনুমান করায়, অন্য কিছুর গন্ধ নয়—ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্পন্দনের নামই বাহ্য বিষয়—ইহাও চরম সত্য নয়। উপরোক্ত বিচার ধারারও এখানেই শেষ নয়; কারণ, শুধু বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্পন্দন হইলেই যে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহা নয়। ঐ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ থাকা দরকার এবং মনও ঐ ভাবে স্পন্দিত হওয়া দরকার। মন যদি অন্যত্র থাকে তবে ঐ বিষয়ের জ্ঞান হইবে না। রেডিওতে সংবাদ শুনিতে শুনিতে মনে অন্য চিন্তা উঠিলে সংবাদের কিছু অংশ শুনা বাদ পড়িয়া যায় এরূপ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। দুর্বাসা মুনি শকুন্তলার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন, না পাইয়া অভিসম্পাত

দিলেন। শকুন্তলার চক্ষু, কর্ণ সবই খোলা ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি কিছুই দেখিলেন না; কিছুই শুনিলেন না; কারণ তখন তাঁহার মন অন্যত্র ছিল—তিনি রাজা দুষ্মন্তের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মন একটাই; তাই চক্ষু যখন গোলাপ ফুল দর্শন করে—নাসিকাও তখন গোলাপ ফুলেরই গন্ধ পায়—অন্য কিছুর নয়।

(খ) তবেই দাঁড়াইল এই যে মন যদি স্পন্দিত হয় তবেই বিষয়ের জ্ঞান হয়; মন স্পন্দিত না হইলে বিষয়ের জ্ঞান হয় না। জাগ্রতে ও স্বপ্নে মন স্পন্দিত হয় তাই জগৎ দর্শন হয়। সুষুপ্তি ও সমাধিতে মনের স্পন্দন থাকে না—তাই জগতের জ্ঞানও থাকে না। জগৎ দর্শনের জন্য চিত্তস্পন্দন এবং জগৎ এ দুইটি জিনিষেরই প্রয়োজন এ কথাও বলিবার উপায় নাই, কারণ স্বপ্নে যে জগৎ দেখা যায় তাহা মনের বাহিরে কোথাও নাই। অর্থাৎ মন একাই স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করে; তাহাতে দ্বিতীয় কোনও বস্তুর অপেক্ষা নাই। এমনকি ইহাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্পন্দনেরও প্রয়োজন নাই। যে আলোক সহায়ে স্বপ্নের জগৎ দেখা যায়, সে আলোক দেহের বাহিরে তো থাকেই না, এমনকি তজ্জন্য রগড়ান বা ঐরূপ অন্য কোনও প্রক্রিয়ার দ্বারা চোখের পর্দায় (retinaতে) স্পন্দন সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনও থাকে না। মন একাই সে আলোক সৃষ্টি করে। একথা স্বপ্নের বেলায় যেরূপ সত্য, জাগ্রতের বেলায়ও তদ্রূপ; অন্যরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। একটু বিচার করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে স্বপ্নে ও জাগরণে কোনও প্রকৃত প্রভেদ নাই। যথা, স্বপ্ন ক্ষণিক ও জাগ্রত অবস্থা স্থায়ী। সুতরাং তাহারা সমান নয়, একথা বলা যায় না—কারণ এ অনুভব জাগ্রতকালেই শুধু হয়; স্বপ্নকালে স্বপ্নকে ক্ষণিক মনে হয় না। আবার, আমার জাগ্রতকালে দৃষ্ট জগৎ অন্যেরাও দেখে, সুতরাং উহা সত্য এবং আমার স্বপ্নের জগৎ শুধু আমিই দেখি, অন্যেরা তাহা

দেখে না, সুতরাং তাহা মিথ্যা—একথাও বলিবার উপায় নাই—কারণ এ প্রকার অনুভবও শুধু জাগ্রতকালেই হয়। স্বপ্নে কিন্তু আমি দেখিয়া থাকি যেন আমার বন্ধুগণসহ আমি নদীতে নৌকায় করিয়া বেড়াইতেছি এবং পাড়ে দাঁড়াইয়া অগণিত লোকে তাহা দেখিতেছে। আমার স্বপ্নের সেই নৌকা, সেই নদী ইত্যাদি শুধু আমি দেখি নাই—আমার স্বপ্নের বন্ধুবর্গ এবং তীরস্থ বহু লোক তাহা দেখিয়াছে। তথাপি যেমন সেই স্বপ্নে দেখা নৌকা বা নদী সত্য নয়, তদ্রূপ জাগ্রতে দৃষ্ট বিষয়সকলও স্বপ্নসম মিথ্যা, অর্থাৎ চিত্তস্পন্দন মাত্র। স্বপ্ন ও জাগরণে যে ভেদ আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, বিচারে তাহা টিঁকে না। আর বিভিন্ন স্বপ্নের মধ্যে যেমন কিছু প্রভেদ থাকিতে পারে, সেইরূপ স্বপ্ন ও জাগরণে যদি কিছু পার্থক্য থাকেও তাহাতেও কিছু আসে যায় না—কারণ উভয়ই যে মানসিক ব্যাপার মাত্র এই মৌলিক বিষয়ে কোনই প্রভেদ নাই; অর্থাৎ জাগরণও এক প্রকার স্বপ্নই। সুতরাং স্বাপ্নিক জগতের ন্যায় জাগ্রত কালে দৃষ্ট জগতও চিত্তস্পন্দন মাত্র—উহার কোনও বাস্তব সত্তা নাই।

১৬। মন হইতে জগতের যদি পৃথক্ কোনও সত্তা থাকিত, অর্থাৎ মন ও জগৎ এ দুইটি যদি পৃথক্ বস্তু হইত, তবে কোনও না কোনও সময়ে বা অবস্থায় মন হইতে জগৎকে অবশ্যই পৃথক্ করা যাইত। কিন্তু তাহা তো কখনই হয় না; মন হইতে পৃথক্ জগৎ কেহ দেখে নাই; দেখা সম্ভবও নয়। মন যদি না থাকে তবে জগৎও থাকে না। সমাধি বা সুষুপ্তিতে যেমনই মন লয়প্রাপ্ত হইল—অমনি জগৎও লয়প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ, মন হইতে আলাদা জগৎ বলিয়া কিছু নাই। যদি থাকিত, তবে মনের নাশে জগতের নাশ হইত না। রাম ও শ্যাম যদি দুইটি পৃথক্ ব্যক্তি হয়, তবে রামের মৃত্যুতে শ্যামেরও মৃত্যু হইবে কেন?

১৭। (ক) দেহ অপেক্ষা মন আমার নিকটতর। দেহের মধ্যে মন; মনের মধ্যে আমি। তাই শুধু দেহের বাহিরের বিষয়ই

নয়, মনের বাহিরের কোনও বিষয়ও আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কোনও কিছু মনে আসিবার পর আমি তাহা জানিতে পারি অর্থাৎ যাহা মনের বাহিরে তাহা আমি জানি না, অর্থাৎ যাহা আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি তাহা আমার মনেই অবস্থিত। বিভিন্ন প্রকার মনের স্পন্দনকেই বিভিন্ন প্রকার বিষয় বলিয়া আখ্যা দেই, কতকগুলিকে বাহ্য দৃশ্য বলিয়া ও কতকগুলিকে মানস দৃশ্য বলিয়া। প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য বা বিষয়মাত্রই মানসিক। "এটা একটি বাহ্য বস্তু"—এরূপ অনুভবও মনেই হয়—উহাও একটা মানসিক ব্যাপার মাত্র। আর এই মানসিক ব্যাপারের অতিরিক্ত কোনও বাহ্য বিষয় নাই। মনের তুলনায় দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণও বাহ্য ; সুতরাং দেহের বহিঃস্থ জগতের ন্যায় দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের অস্তিত্ববোধও মানসিক ব্যাপার মাত্র ; অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণও মনেই অবস্থিত, মনের কল্পনা মাত্র। ইহাদেরও কোনও বাস্তব সত্তা নাই।

(খ) বিষয়টির গুরুত্ববোধে, সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য আরও একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই বইখানি যদি অন্য ঘরে থাকে তবে আমি ইহা জানিতে পারি না ; আমার এই ঘরে আসিলে পর তবে আমি তাহা জানিতে পারি। শুধু আমার ঘরে আসিলেই হয় না ; বইটি আমার চোখে পড়া দরকার। শুধু চোখে পড়িলেও কিন্তু তাহার জ্ঞান হয় না, মন যদি অন্যত্র থাকে। যখন ওটা মনে আসে তখনই মাত্র উহার জ্ঞান হয় ; তৎপূর্বে হয় না। অর্থাৎ, মনের বাহিরে অবস্থিত কোনও কিছু আমি জানিতে পারি না। সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হইল যে যাহা কিছু আমি জানি তাহা আমার মনেই অবস্থিত। কোনও বিষয়ই প্রকৃতপক্ষে মনের বাহিরে নাই। অজ্ঞান, অর্থাৎ অবিবেচনাবশতঃই মানসিক দৃশ্য-বিশেষের নাম দেওয়া হয় বাহ্যবিষয়।

১৮। (ক) যদি বলা যায় যে মনের যে সকল বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন আমি প্রত্যক্ষ করি তাহা সৃষ্টি করিবার জন্য কোনও বাহ্য

কারণ থাকা আবশ্যক —তাহাও কোনও কাজের কথা নয়। কারণ, মানসিক দৃশ্যবিশেষের কারণ হিসাবে যদি কোনও বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে ঐ বাহ্য বস্তুও যে সত্যই আছে—তাহা স্বীকার করিবারও কারণ বা যুক্তি খুঁজিতে হয়। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ঐ কারণ বা যুক্তি একমাত্র এই যে, মনে উহার জ্ঞান হইতেছে, মন ঐরূপে স্পন্দিত হইতেছে। অন্য কোনও পৃথক্ কারণ বা যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, যে মানসিক ব্যাপারের কারণ হিসাবে উক্ত বাহ্য বস্তুটির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা হইল, তাহারও অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজিতে গিয়া ঐ মনোব্যাপার-বিশেষেই ফিরিয়া আসিতে হয়। অর্থাৎ মনের স্পন্দনের কোনও বাহ্য কারণ নাই। বাহ্য বস্তু মিথ্যা। কোনও কোনও মানসিক দৃশ্যবিশেষকেই বাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং অনাদি অজ্ঞানজাত সংস্কারবশতঃ ঐ নামে মুগ্ধ হইয়া উহাকে মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তু বলিয়া ভুল করা হয়।

(খ) মনও কিন্তু আত্মচৈতন্য হইতে পৃথক্ কোনও বস্তু নয়। মন হইতে তাহার চৈতন্যাংশ বাদ দিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। চৈতন্য-বিহীন মন কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং মন সর্বাংশেই চৈতন্যই। স্পন্দিতরূপে প্রতীয়মান্ আত্মচৈতন্যকেই মন বলা হয়।

১৯। (ক) বাহ্য বিষয় বা বাহ্য দৃশ্যের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তাহাদিগের যে মূল, অর্থাৎ যে কারণে বাহ্য বিষয় আছে বলিয়া মনে হয়, সেই বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান কি প্রকারে ও কোথায় হয় তাহারই সন্ধান করিয়াছি। দেখিয়াছি যে ঐ জ্ঞান মনেই হয়; সব জ্ঞানই মনেই হয়। তাহাদিগকেই আমি প্রত্যক্ষ করি। তাহাদেরই কয়েকটিকে বাহ্য বিষয় বলিয়া নামকরণ করা হয় মাত্র। স্বপ্ন ইহার একটি উত্তম উপমা। প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। বাহ্য বস্তু না থাকিলেও যে তাহা দেখা,

শুনা বা স্পর্শ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ তাহার জ্ঞান হইতে পারে, স্বপ্ন তাহার দৃষ্টান্ত। উহা হইতে বুঝা যায় যে দেখা মানে যে উহার পিছনে, ঐ দেখার অতিরিক্ত, অন্য বস্তু থাকিবে, তাহা নয়। দেখাটা যে শুধু দেখাই—এটাই প্রকৃত সত্য। ঐ দেখাটাই বস্তু; অন্য বস্তুকে যে দেখি তাহা নয়। জগৎ দেখি বা জানি বলিয়াই যে ঐ দেখা বা জানার অতিরিক্ত জগৎ বলিয়া কোনও জড় বস্তু আছে —এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসা নিতান্তই অযৌক্তিক। অথচ, জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে, জগতের জ্ঞান হয়, ইহা ছাড়া অন্য যুক্তি নাই। সুতরাং বাহ্য জগৎ বলিয়া মনের অতিরিক্ত কিছু নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

(খ) আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মনে করা যাউক যেন সিনেমা ঘরে বসিয়া আছি। সমস্ত আলোক নিভিয়া গেল; ঘর অন্ধকারময় হইল। তাহার পর একটা সাদা আলোকরশ্মি পিছন দিক হইতে আসিয়া সম্মুখে অবস্থিত একটি সাদা পর্দায় সর্বত্র সমানভাবে পতিত হইল। তৎপরে, ঐ আলোকরশ্মির উৎপত্তি স্থলের সম্মুখে, আলোক-রশ্মির পথে, একটি "ফিল্ম্" রাখা হইল। ফিল্ম্স্থ ছবির দাগের জন্য আলোকরশ্মিটি এখন আর পর্দার সকল স্থলে সমানভাবে পতিত হইতে পারিল না; স্থানে স্থানে কম বেশী বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, কোথাও অধিক, কোথাও বা কম তীব্রভাবে পড়িতে লাগিল। অতঃপর ফিল্ম্ চলিতে থাকিলে পর্দার বিভিন্ন স্থানে আলোকপাতের তীব্রতার এই বিন্যাসটি এইক্ষণে এই প্রকার ও পরক্ষণেই অন্যপ্রকার হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার ফল হইল কি? ফল হইল—যেখানে ছিল একটা সাদা পর্দা মাত্র, সেখানে দেখা দিল আকাশ, পাহাড়; নদ, নদী; ফল, ফুল; বাড়ী, ঘর; রাস্তা, ঘাট; ট্রেন, মোটর; এরোপ্লেন, জাহাজ; মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ; নিকট ভাব, দূরভাব; স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ; রোগ, শোক, হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা, প্রেম; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ; আরও কত কি! নিছক আলোকপাতের স্পন্দনে সমগ্র

বিশ্বজগৎটাই সৃষ্ট হইল! দর্শকগণ তাহা দেখিয়া কখনও উল্লসিত, কখনও বিষাদগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। অথচ এই বিশ্বজগৎ প্রকৃত-পক্ষে তো সৃষ্ট হয় নাই! ভুলই এই জগৎ-সৃষ্টির ভিত্তি! ঐ সিনেমা ঘরে বসিয়াই যদি কোনও ব্যক্তি সিনেমা ব্যাপারের প্রকৃত স্বরূপটি—অর্থাৎ এটা একটা আলোকপাতের স্পন্দনমাত্র—এই সত্যটি দৃঢ়-চিত্তে সর্বক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারেন, তবে তাঁহার নিকট সিনেমার জগৎ দর্শন বন্ধ হইয়া যাইবে। ঠিক এইরূপে চিত্তস্পন্দনকেই অজ্ঞানবশে বাহ্য জগৎ বলিয়া ভুল হয়। অজ্ঞানে জগতের সৃষ্টি; জ্ঞানোদয়ে জগৎ-দর্শন বন্ধ হইয়া যায়। তখন অন্তরে ও বাহিরে, সর্বত্র শুধু আত্ম-চৈতন্যেরই অনুভব হয়।

২০। (ক) জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপ বিচার করিতে গিয়া আমরা প্রথমে দেখিয়াছি যে—

(i) বাহ্য জগৎ বলিয়া বাস্তবে কিছু নাই; ইন্দ্রিয় স্পন্দনকেই বাহ্য জগৎ বলিয়া ভুল হয়। এবং আরও অগ্রসর হইয়া পরে দেখিয়াছি যে,

(ii) ইন্দ্রিয় স্পন্দনও প্রকৃতপক্ষে চিত্তস্পন্দন মাত্র; উহাও সত্য নয়; মনের বিভিন্ন প্রকার স্পন্দনকেই বাহ্য জগৎ, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়।

একটু চিন্তা করিলেই কিন্তু পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে এই দুইটি সিদ্ধান্তেই অতি সরল একটি মাত্র মৌলিক যুক্তি বা সত্য নিহিত আছে। এই মৌলিক যুক্তি বা সত্যটি এই ঃ—

"জ্ঞাতার পক্ষে নিজের বাহিরের বা নিজ হইতে পৃথক্ কিছু জানা সম্ভব নয়; অর্থাৎ, জ্ঞাতা যাহা কিছু জানে তাহা জ্ঞাতার অন্তরেই অবস্থিত।"

জ্ঞাতার অন্তঃস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোনও বিষয়ের জ্ঞান হয় না। জানা মানেই জ্ঞাতাতে একটা ব্যাপার হওয়া—অর্থাৎ উহা জ্ঞাতার অন্তঃস্থ হওয়া। "জ্ঞাতা নিজের বাহিরের কিছু অথবা নিজ হইতে

পৃথক্ কিছু জানে" একথা বলা আর "অন্তঃস্থ বস্তু অন্তঃস্থ নয়" একথা বলা একই কথা; অর্থাৎ, ইহা একটি অসম্ভব ও স্ববিরোধী কথা (contradiction in terms) । সকল বিশেষ জ্ঞানই জ্ঞাতার অন্তরে অবস্থিত—এই গুলিকেই মাত্র সে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে সক্ষম বা জানে। অজ্ঞানবশে অন্তরস্থ জ্ঞানখণ্ডগুলিকেই সে বিষয় বলিয়া ভুল করে। উপরের প্রথম, অর্থাৎ (i) সংখ্যক সিদ্ধান্তটি এই মৌলিক যুক্তি বা সত্যের প্রয়োগে প্রথম পদক্ষেপ এবং দ্বিতীয়, অর্থাৎ (ii) সংখ্যক সিদ্ধান্তটি ঐ একই যুক্তি বা সত্যের প্রয়োগে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর দ্বিতীয় পদক্ষেপ মাত্র। উপরোক্ত মৌলিক যুক্তি বা সত্যটি এতই সরল ও স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ (axiomatic), যে ইহার আর অন্য প্রমাণ সম্ভব নয়। এই অতি সরল তত্ত্বের উপরেই অদ্বৈত-তত্ত্বের মূল যুক্তিটির প্রতিষ্ঠা; কোনও জটিল তর্কজালের উপর নয়। পাঠক এই তত্ত্বটি চিত্তের কিঞ্চিৎ একাগ্রতার দ্বারা স্বয়ংই উপলব্ধি করিবেন। আর, জ্ঞাত—সুতরাং অন্তঃস্থ বস্তু অন্তরেই অবস্থিত, বাহিরে নয় এইটুকুই মাত্র অদ্বৈত বেদান্তের সার কথা। অদ্বৈত-তত্ত্বের ন্যায় এত সরল তত্ত্ব আর কিছুই নাই।

(খ) আমরা এখন উপরোক্ত মৌলিক যুক্তি বা সত্যের প্রয়োগে উহার তৃতীয় বা শেষ পদক্ষেপে যে সূক্ষ্মতম চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় তাহার কথাই বলিব। অর্থাৎ ঐ সত্যের চরম মর্ম কি তাহাই বলিব। ঐ সত্যানুসারে, জ্ঞাতা বা আত্মার পক্ষে নিজ হইতে পৃথক্ কিছু জানা সম্ভব নয়, অর্থাৎ, যাহাই সে জানে তাহা আত্মার অন্তরেই অবস্থিত। আত্মা কিন্তু সমরস শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ; তাহার আকার, সীমা ইত্যাদি কিছুই নাই। সুতরাং আত্মার অন্তরে অবস্থিত বলিলে বুঝিতে হইবে, আত্মা হইতে অপৃথক্ ভাবে, আত্মার সহিত একাকার হইয়া অবস্থিত। মনও আত্মার জ্ঞেয়; সুতরাং মনেরও আত্মার অতিরিক্ত, আত্মা হইতে পৃথক্, কোনও অস্তিত্ব নাই; মনও আত্মাই। ভ্রমবশতঃই তাহাকে জ্ঞেয়রূপে,

অর্থাৎ অনাত্মরূপে মনে হয়। ভ্রমে তো অনেক কিছুই হয়। স্বপ্নে নিজের এক চিত্তই দ্রষ্টা ও বিভিন্ন দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হয়; তপ্ত বালুকার বা তপ্ত পীচের রাস্তার উপরকার উষ্ণ বায়ুকে জল বলিয়া মনে হয়; অল্পালোকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয়; সিনেমাঘরে পর্দার উপরকার আলোকপাতের তারতম্যকে নানা বস্তু, ঘটনা ও ভাবরূপে মনে হয়। বাস্তবিকপক্ষে (জ্ঞাতার বা) আত্মার অতিরিক্ত, আত্মা হইতে পৃথক্ কোনও বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। বিষয়সকলের পৃথক্ অস্তিত্বের প্রতীতি মিথ্যা।

(গ) জ্ঞেয় বলিয়া জ্ঞাতার অতিরিক্ত কিছু বাস্তবে নাই; এই সত্যটি যখন হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন জ্ঞেয় বস্তুর আত্যন্তিক অভাবে জ্ঞাতার জ্ঞাতাগিরিও বন্ধ হইয়া যায়। জ্ঞানোদয়ের পূর্বে যে ছিল জ্ঞাতা, জ্ঞানোদয়ে সে স্থির চৈতন্য বা চিৎ বা শুদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মেই পর্যবসিত হইয়া যায়। জ্ঞেয় জ্ঞাতায় লীন হয় এবং জ্ঞাতা চিন্মাত্রে পর্যবসিত হয়; অর্থাৎ জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা একাকার হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যে পর্যবসিত হয়।

(ঘ) এই আলোচনার আরম্ভে বলা হইয়াছিল যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় কখনও এক হয় না; এখন বলা হইল যে জ্ঞেয় জ্ঞাতা হইতে অভিন্ন। বুদ্ধিমান্ পাঠক ইহার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি দেখিবেন না; কারণ, যতক্ষণ কোনও কিছুকে জ্ঞেয়রূপে, দৃশ্যরূপে মনে হয়, ততক্ষণ তাহা আত্মা হইতে ভিন্নই—জ্ঞেয়ত্ব বা দৃশ্যত্ব মানেই অনাত্মত্ব। কারণ, আত্মাতে কোনও দৃশ্যত্ব নাই। ইহাই আমাদের বিচারের প্রথম অংশ। কিন্তু, বিচারে আরও অগ্রসর হইয়া যখন বুঝা যায় যে জ্ঞেয় বস্তুও প্রকৃতপক্ষে আত্মাই—তাহার পৃথক্ অস্তিত্বের প্রতীতি মিথ্যা—তখন একদিকে যেমন জ্ঞেয়ের জ্ঞেয়ত্ব বা দৃশ্যত্বই আর থাকে না, অন্য দিকে তেমনই জ্ঞাতারও জ্ঞাতৃত্ব বন্ধ হইয়া যায়; থাকে শুধু শুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ আত্মা। সেই জন্যই পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান সব একাকার হইয়া যায়।

২১। জ্ঞেয়-জ্ঞাতা-সম্বন্ধবিষয়ক পূর্বোক্ত কথাটি আরও এক ভাবে বলা যাইতে পারে। আমরা কাল্পনিক বস্তুকে মিথ্যা বলি কেন? বলি এই জন্য, যে আপাতদৃষ্টিতে কাল্পনিক বস্তুটির, কল্পনাকারী হইতে পৃথক একটি নিজস্ব স্বাধীন সত্তা আছে বলিয়া মনে হইলেও, বিচার করিলে দেখা যায় যে উহার ঐরূপ কোনও স্বাধীন সত্তা ও পৃথক্ অবস্থান নাই। উহার সত্তা কল্পনাকারীর কল্পনার উপর নির্ভরশীল এবং কল্পনাকারীর অন্তরেই তাহার অবস্থান। ঠিক এই কারণেই, যে সকল বস্তুকে আমরা সাধারণতঃ সত্য বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে, সে সকল জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব তৎপ্রকার জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এবং সেই সেই জ্ঞান জ্ঞাতার অন্তরেই অবস্থিত বলিয়া, তাহাদের জ্ঞাতার অতিরিক্ত স্বাধীন সত্তা কিছু নাই; তাহারা জ্ঞাতার অন্তরেই অবস্থিত। অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতাই আছেন—জ্ঞেয় নাই। জ্ঞাতাই সত্য, জ্ঞেয় মিথ্যা। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মনও জ্ঞেয়; তাই মনও মিথ্যা।

২২। যাহাই জ্ঞেয় অর্থাৎ যাহারই জ্ঞাতা আছে—তাহাই মিথ্যা, কারণ তাহার অবস্থান যেখানে বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সেখানে, অর্থাৎ জ্ঞাতার বাহিরে নয়; তাহার যে জ্ঞাতা সেই জ্ঞাতার অন্তরেই তাহার অবস্থান। দেহের বহিঃস্থ জগৎ জ্ঞেয়, তাই সে জগৎ মিথ্যা; বাহ্য জগতের অস্তিত্ব দেহের বাহিরে নয়, তাহার যে জ্ঞাতা সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণও বাস্তবিক জ্ঞাতা নয়—ইহারা জ্ঞানের মাধ্যম মাত্র; এবং ইহারাও জ্ঞেয়—তাই ইহারাও মিথ্যা; তাহাদের প্রকৃত অবস্থান তাহাদের যে জ্ঞাতা সেই মনের মধ্যে। মনও কিন্তু প্রকৃত জ্ঞাতা নয়, সেও জ্ঞানের যন্ত্র মাত্র; এবং সেও জ্ঞেয়, তাই সেও মিথ্যা। তাহার প্রকৃত অবস্থান তাহার যে জ্ঞাতা সেই আত্মাতেই, আত্মার অন্তঃস্থলে, অর্থাৎ আত্মার সহিত একাকার বা অপৃথক্ ভাবে। বাহ্য জগৎ ইন্দ্রিয়বর্গে; ইন্দ্রিয়বর্গ, দেহ, ও প্রাণ মনে; এবং মন আত্মাতে অবস্থিত; অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে সব

কিছুই আত্মাতে অবস্থিত। বস্তুতঃ বাহ্য জগৎ, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ই একই পর্যায়ভুক্ত—সকলেই আত্মার জ্ঞেয়, সকলেই জড়, সকলই মিথ্যা। এ সকলই যাঁহার জ্ঞেয়, তিনি আত্মা, তিনিই প্রকৃত জ্ঞাতা, একমাত্র জ্ঞাতা। তাঁহার আর জ্ঞাতা কেহ নাই। আত্মা ভিন্ন অন্য জ্ঞাতা কেহ নাই। ইন্দ্রিয়-বর্গ, মন ও অহঙ্কারকে চেতন মনে হইলেও, বাস্তবিক ইহারাও জড়; কারণ, ইহাদের অস্তিত্ব এবং ইহাদের আপাতপ্রতীয়মান জ্ঞাতৃত্বও আত্মার নিকট জ্ঞেয়। সুতরাং ইহাদের চেতনভাব মিথ্যা—আত্ম-চৈতন্যের প্রতিফলন মাত্র। আত্মার জানা বা কল্পনাতেই সকল বিষয়ের প্রতিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়গণকে অল্প, মনকে কিঞ্চিৎ অধিক ও অহঙ্কারকে আরও অধিক চেতন বলিয়া তিনি কল্পনা করেন বলিয়াই উহাদিগকে ঐরূপ মনে হয়। আমার স্বপ্নে দেখা বৃক্ষাদির অল্পচৈতন্য, পশুপক্ষীর কিঞ্চিৎ অধিক চৈতন্য এবং মানুষের অধিক চৈতন্য যেমন মিথ্যা—আমারই কল্পিত—সেইরূপ। আত্মাই শুধু চেতন; আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতা; আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু। আর সবই মিথ্যা; আত্মার কল্পনামাত্র।

২৩। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার সারমর্ম এই যে, জ্ঞেয় বা বিষয় (object) মাত্রই মিথ্যা; শুদ্ধ চিৎস্বরূপ জ্ঞাতা (subject) বা আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু। অজ্ঞানবশে তাহাকেই স্পন্দিত মনে হইলে, চিৎ, চিৎই থাকিয়া শুধু স্পন্দিতের ন্যায় মনে হইলেই, জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—অজ্ঞাননাশের ফলে জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। চৈতন্যের স্পন্দনও কিন্তু জ্ঞেয়, সুতরাং তাহাও মিথ্যা। সত্য শুধু স্থির শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র—যাহা কাহারও জ্ঞেয় নয়। অর্থাৎ চৈতন্যকে অজ্ঞানবশে স্পন্দিত মনে হইলেও চৈতন্য বস্তুটা চৈতন্যই থাকে, নূতন বা পৃথক কোনও বস্তু হইয়া যায় না। ঘটের আকার প্রাপ্ত হইলেও মাটি যেমন মাটিই থাকে অন্য পদার্থ হইয়া যায় না; বলয়ের আকার ধারণ করিলেও

স্বর্ণ যেমন স্বর্ণ ই থাকে, রৌপ্য বা অন্য কোনও পদার্থ হইয়া যায় না; তপ্ত বালুকার উপরস্থ বায়ু যেমন জল বলিয়া প্রতীত হইলেও বায়ুই থাকে; স্বপ্নকালে একই চিত্ত যেমন সমুদ্র পর্বতাদিসহ বাহ্য জগৎ ও তাহার দ্রষ্টা—এই উভয়রূপে প্রতিভাত হইলেও এক চিত্তই থাকে, সমুদ্র পর্বতাদি হইয়া যায় না; সিনেমা ঘরে পর্দার উপর পতিত আলোকরশ্মির স্পন্দনকে বিশ্বজগৎ বলিয়া মনে হইলেও তাহা যেমন আলোকরশ্মি ব্যতীত আর কিছুই নয়; অথবা সর্পরূপে প্রতীত হইবার ক্ষণেও যেমন রজ্জু রজ্জুই থাকে, সত্য সত্যই সর্প হইয়া যায় না। বস্তুতঃ এ সকলের অপেক্ষাও তরঙ্গায়িতপ্রায় চৈতন্যের শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপতা আরও অধিক সত্য—সম্পূর্ণ সত্য। কারণ, জলের তরঙ্গায়িতভাবের অনুভব জল দ্বারা হয় না; জল হইতে পৃথক একটি দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা হয়। অজ্ঞানকৃত জ্ঞান বা চৈতন্যের তরঙ্গায়িত বা খণ্ডভাবটির অনুভব কিন্তু ঐ একই বস্তু দ্বারা, অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাই হয়; অর্থাৎ জ্ঞানের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জ্ঞানের তরঙ্গায়িত বা খণ্ডভাবটির অর্থাৎ নামরূপের অনুভবও জ্ঞানই। সুতরাং তরঙ্গায়িতরূপে অর্থাৎ বিষয়রূপে প্রতিভাত হইলেও জ্ঞানবস্তুটি জ্ঞানই থাকে; শুদ্ধ চৈতন্য ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। বাহ্য বা মনোজগৎ বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয় তাহা শুদ্ধ চৈতন্যই। এই সত্যটি বুঝিতে পারিলে মন এই ঐক্যে, এই সাম্যেই নিষ্ঠ হইতে চায়—কারণ মিথ্যার প্রতি মনের আগ্রহ বা প্রীতি নাই—মন সত্যেরই পূজারী। মন যখন নাম-রূপ দর্শন করে তখন নাম-রূপকে সত্য মনে করে বলিয়াই তাহা করে। পরে যখন নাম-রূপকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে—তখন আর নাম-রূপের প্রতি তাহার কোনও টান, কোনও অভিনিবেশ থাকে না। মনে তখন জ্ঞানের শুদ্ধ ভাবটি, অর্থাৎ অখণ্ড ভাবটিই সমধিক প্রতিভাত হয়—অর্থাৎ নামরূপ লুপ্তপ্রায় হয়। নামরূপের মিথ্যাত্ববোধ সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইলে জগৎ-দর্শন একেবারেই বন্ধ হইয়া

যায়; তখন অন্তরে বাহিরে সদা সর্বদা শুধু আত্মসত্তা বা ব্রহ্মসত্তারই অনুভব হয়। জ্ঞানের চরম অবস্থায়, অনুভব্য দ্বিতীয় বস্তুর আত্যন্তিক অভাবে সে অনুভবও বন্ধ হইয়া যায়। সে অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

২৪। (ক) যে শক্তি দ্বারা আত্মা নিজেকে তরঙ্গায়িত বলিয়া কল্পনা করেন—তাহাকে শাস্ত্রে মায়া বলা হইয়াছে। নামরূপগ্রস্ত জ্ঞানও শুদ্ধ জ্ঞানই—অন্য কিছু নয়, এই সত্যে লক্ষ্য থাকিলে জ্ঞানের তরঙ্গায়িত ভাবটা আর থাকে না; অর্থাৎ, তখন মায়াশক্তি নিষ্ফলা হইয়া যায়। জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃই চৈতন্যকে তরঙ্গায়িত মনে হয় এবং ঐ তরঙ্গায়িত চৈতন্যকেই অজ্ঞানবশতঃ বাহ্য ও আন্তর জগৎরূপে দর্শন হয়। জ্ঞানোদয়ে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রই অনুভূত হয়—জগৎ দেখা যায় না। তখন মায়াও থাকে না। অজ্ঞানদশায়ই মায়ার অস্তিত্ব; জ্ঞানোদয়ে মায়ার নাশ।

(খ) এই মায়ার স্বরূপ কি? উত্তরে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে উহা কল্পনা বা অজ্ঞান বা ভুল বুঝা জাতীয় একটি ব্যাপার। আত্মার পক্ষে এটি কল্পনা—ইহার সাহায্যে তিনি জগৎ কল্পনা করিয়া নিজেই তাহা দর্শন করেন। তাঁহার কল্পিত জগদান্তর্গত জীবের পক্ষে ইহা অজ্ঞান, অর্থাৎ ভুল জ্ঞান। ইহার দ্বারা সে জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করে এবং নিজের দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকেও সত্য বলিয়া মনে করে। ফলে, নিজেকে ঐ সকল দ্বারা সীমিত, জন্ম-ব্যাধি-জরা-শোক-মৃত্যুগ্রস্ত ক্ষুদ্র জীব মনে করিয়া—আমি যে ব্রহ্মই, একথা ভুলিয়া গিয়া—সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হয়। মায়া একেবারেই নাই তাহা বলা যায় না; কারণ, ইহারই প্রভাবে অজ্ঞানদশায় জগৎ দর্শন হয়। আবার মায়া সত্য সত্যই আছে একথাও বলা যায় না; কারণ, জ্ঞানালোকে ইহার নাশ হয়। কল্পনা বা অজ্ঞান বা ভুল বুঝাকে তো আর সত্য বলা যায় না! সুতরাং মায়াকে অনির্বচনীয়া বলা হয়।

(গ) অজ্ঞান বা মায়া প্রথমে কবে ও কি ভাবে উৎপন্ন হইল, এ প্রশ্ন মনে উদয় হইলেও ইহার সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ প্রশ্নটিই ঠিক ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। মায়ার পারমার্থিক সত্যতা নাই ; কারণ, বিচারে উহার নাশ হয়—তখন শুধু আত্মাই থাকেন। যাহা প্রকৃতপক্ষে নাই তাহার উৎপত্তি কবে ও কি ভাবে হইল—এ প্রশ্নটাই ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। অজ্ঞানের উৎপত্তির স্থল বা ক্ষণ দেখিতে হইলে তাহার পূর্ববর্তী অবস্থায় যাইতে হয় ; কিন্তু সেখানে গেলে অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হইলে আর অজ্ঞানকে দেখাই যায় না ; অজ্ঞান যে কখনও ছিল তাহাই মনে হয় না ; সুতরাং এ প্রশ্নও আর থাকে না। যে ব্যক্তি অজ্ঞান দেখে বা অনুভব করে এ প্রশ্ন তাহারই প্রশ্ন—অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির প্রশ্ন—যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণই এ প্রশ্ন। কিন্তু অজ্ঞানকে আঁকড়াইয়া রাখিয়া কোনও তত্ত্ব, এমনকি অজ্ঞানেরও তত্ত্ব জানা যায় না। আবার অজ্ঞানকে বিসর্জন দিলে অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হইলে এ প্রশ্নও থাকে না। অজ্ঞ জীবের পক্ষে তৎপ্রসূতি যে অজ্ঞান বা মায়া, তাহার জন্ম দেখা সম্ভব নয় ; কেহই তাহার মাতার জন্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞান-সংস্কারকে অনাদি বলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অজ্ঞান বা মায়া অনাদি হইলেও কিন্তু অনন্ত নয়—কারণ, জ্ঞানোদয়ে তাহার নাশ হয়।

২৫। চিনির বাঘ, চিনির হরিণ, চিনির ঘোড়া—এ সব জন্তু আছে, কি নাই ? অজ্ঞ শিশুর নিকট সত্যসত্যই আছে ; প্রবীণ ব্যক্তির নিকট থাকিয়াও নাই ; এবং চিনির নিজের নিকট একেবারেই নাই। তাহাকে বাঘের আকারই দেওয়া হউক বা হরিণের আকারই দেওয়া হউক বা ঘোড়ার আকারই দেওয়া হউক—সে তাহা লক্ষ্যই করিবে না। সে জানে যে সে সর্বদাই স্রেফ্ চিনিই আছে—তাহার কোনও পরিবর্ত্তনই হয় নাই। সেইরূপ, অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জগৎ সত্য, বিচারশীল ব্যক্তির নিকট

জগৎ মিথ্যা এবং দৃঢ়জ্ঞানী ব্যক্তি জগৎ দর্শন করিয়াও তাহাকে নাম-রূপবর্জিত শুদ্ধ আত্মচৈতন্যরূপেই অনুভব করেন—আর কোনও দ্বিতীয় বস্তুই তিনি দর্শন করেন না।

২৬। স্বাপ্নিক জগৎ স্বপ্নদ্রষ্টা হইতে পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নদ্রষ্টার চিত্তেই অবস্থিত—স্বাপ্নিক জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণে ইহাই প্রথম ও প্রধান যুক্তি। এ যুক্তি জাগ্রৎকালীন জগতের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সুতরাং যে কারণে স্বাপ্নিক জগৎ মিথ্যা, ঠিক সেই কারণেই জাগ্রৎকালীন জগৎও মিথ্যা। এই কথাটাই এতক্ষণ বুঝানর চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু স্বাপ্নিক জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণে আরও একটা যুক্তি আছে। সেটা এই যে স্বপ্নভঙ্গ হইলে ঐ জগৎ আর থাকে না। জাগ্রৎকালীন জগৎও কিন্তু জাগ্রদবস্থার ভঙ্গে, যথা স্বপ্নদর্শনকালে, থাকে না। সুতরাং অস্থায়ী বলিয়া যদি স্বপ্নদৃশ্য মিথ্যা হয়, তবে ঠিক ঐ একই কারণে জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জগৎও মিথ্যা। সুষুপ্তিকালে জাগ্রৎ জগৎও থাকে না, স্বাপ্নিক জগৎও থাকে না। জাগ্রৎ বা স্বপ্নকালে সুষুপ্তি থাকে না। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থাই অস্থায়ী, অনিত্য; যখন একটি থাকে তখন অপর দুইটি থাকে না। সুতরাং এ তিনটিই ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা। সত্য শুধু সেই দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা বা আত্মা, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থার কোনওটিতে লিপ্ত না হইয়া এই তিন অবস্থা শুধু দর্শন করেন বা তাহাদের সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন। তাঁহার সাক্ষ্যের উপরই যখন এই তিন অবস্থার সাময়িক অস্তিত্ব নির্ভর করে, তখন তিনি যে তিন অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহার অভাব কোনও কালেই নাই। তিনিই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু।

২৭। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে, প্রচলিত প্রথানুসারে, স্বাপ্নিক ও জাগ্রৎকালীন জগতের অস্থায়ীত্বকে তাহাদের মিথ্যাত্ব নিরূপণে একটি

পৃথক যুক্তি হিসাবে দেখান হইয়াছে ; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে এই যুক্তিটাও আমাদের প্রথম যুক্তিরই অন্তর্গত। কোনও বস্তু অস্থায়ী বলিয়াই মিথ্যা, সাময়িক বস্তু সত্য হইতে পারে না—ইহা বলিবারও তো যুক্তি চাই! ইহার যুক্তি এই যে অস্থায়ী বস্তুও অবশ্যই জ্ঞেয় ; কারণ, তাহার বিকার বা উৎপত্তি-বিনাশ দেখিয়াই তো তাহাকে অনিত্য বলা হয়! সুতরাং আমাদের প্রথম যুক্তি অনুসারেই, অর্থাৎ অস্থায়ী বা অনিত্য বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব দ্বারাই তাহার মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং মূল যুক্তি মাত্র একটি বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। জ্ঞেয় বিষয়মাত্রই মিথ্যা—এইটাই চরম যুক্তি।

২৮। (ক) সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে, বাহ্য জগৎ দেখা যায় বা জানা যায়, এইটাই তো বাহ্যজগতের অস্তিত্বের পক্ষে একমাত্র যুক্তি! অথচ, এ যুক্তি যে কোনও প্রকৃত যুক্তিই নয়, তাহা স্বাপ্নিক জগতের দৃষ্টান্তের দ্বারাই বুঝা যায়। স্বাপ্নিক জগৎও তো দেখা যায় বা জানা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া তো স্বাপ্নিক জগৎকে সত্য বলা যায় না! তবে জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জগৎকেই বা সত্য বলিব কেন? দেখাটা যে শুধু দেখাই—একটা জানার ব্যাপার—বা জ্ঞানের খেলামাত্র বা চিৎস্পন্দনমাত্র এইরূপ বলিলেই দেখা বা জানা ব্যাপারটি ঠিক যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি সেইরূপে, অর্থাৎ কোনও রূপ কল্পনা বা অতিরঞ্জন বর্জিতরূপে—অর্থাৎ প্রকৃত সত্যরূপে বলা হয়। দুঃখের বিষয়, এই নিছক জ্ঞানের খেলাকে, জ্ঞানখণ্ডগুলিকে, মিথ্যা কল্পনাবশে অতিরঞ্জিত করিয়া জ্ঞানাতিরিক্ত জড় বস্তু বলিয়া ভুল করি। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে জড় বলিয়া কিছু নাই, বা থাকিতে পারে না। "এটা একটা জড় বস্তু" এই প্রকার অনুভব-বিশেষ বা জ্ঞানখণ্ডকেই জড় বস্তু বলিয়া ভুল করি। এমনই মায়ার মোহিনী শক্তি!

(খ) বহু জন্মজন্মান্তরের অজ্ঞানজাত কুসংস্কারের বশে আমরা

বাহ্য জগৎ, দেহ ইত্যাদিকে জড় বলিয়া ভাবিতে এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে তাহার বিপরীত কথাটি যুক্তিযুক্ত হইলেও সহসা ধারণা করিতে পারি না। নতুবা এই সত্যদর্শন শক্ত হওয়া উচিত নয়। বাহ্যই হউক বা আন্তরই হউক, কোনও জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্বের প্রশ্ন আদৌ কেন উঠে, একথা বিবেচনা করিলে পাঠক দেখিবেন যে জ্ঞাতার অন্তরে তৎতৎ প্রকার জ্ঞান হয় বলিয়াই উহা হয়। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা বিভিন্ন প্রকার অনুভব মাত্র; তাহাকেই বিষয় নামে অভিহিত করা হয়। বাস্তবে বিষয় বলিয়া কিছু নাই। জগৎকে জগদাকারগ্রস্ত জ্ঞানখণ্ডরূপে এবং জ্ঞানের জগদাকারগ্রহণকেও তৎপ্রকার অনুভববিশেষ অর্থাৎ জ্ঞানরূপে বুঝা—অর্থাৎ সবই শুদ্ধচৈতন্যমাত্র এইটি বুঝা খুব শক্ত হওয়া উচিত নয়, শুধু যদি মনটা কুসংস্কারমুক্ত হইয়া সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত দ্বার থাকে। বিষয়-বাসনা মনকে বিষয়ে আবদ্ধ রাখিয়া সত্য গ্রহণ করিতে দেয় না; তীব্র বৈরাগ্য মনকে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সত্য গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। দেবদত্ত নামক কোনও সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যেমন নিজকে "আমি দেবদত্ত" এইরূপ অনুভব করিবার জন্য কোনও যুক্তি-বিচারের প্রয়োজন হয় না, ঠিক সেইরূপ সহজেই একজন ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি বিনা বিচারেই আন্তর ও বাহ্য সমস্ত বিশ্বকেই আত্মচৈতন্যরূপে দর্শন করেন। শুধু তাহাই নয়, একজন অত্যন্ত বৈরাগ্যবান ও তীক্ষ্ণধী সাধক যদি একবার মাত্র এই তত্ত্ববাক্য শ্রবণ করেন তবে তৎক্ষণাৎ তাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিতে সক্ষম হন; ইহার জন্য তাহাকে অধিক যুক্তি-বিচার দর্শাইতে হয় না। উপনিষৎ শাস্ত্রে অনেক স্থলেই সমস্ত বিশ্বজগৎকে নিজ আত্মা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—কিন্তু তাহা বলিবার পক্ষে কোনও যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

২৯। (ক) এখানে যে একটি সূক্ষ্ম সন্দেহ কোনও কোনও পাঠকের মনে উঠিতে পারে তাহা এই ঃ—আমি যে জগৎ দেখিতেছি

বা জানিতেছি তাহা আমার অন্তরেই অবস্থিত হউক, কিন্তু আমি জানি না এরূপ কোনও জগৎ তো আমার বাহিরে কোথাও থাকিতে পারে! তাহার উত্তর এই যে, না, তাহাও হইতে পারে না। প্রথমতঃ আত্মা সর্ব ব্যাপক ও নীরন্ধ্র; তাঁহার বাহিরে, তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছু থাকিতে পারে না, কারণ তাঁহার বাহির বলিয়া কোনও স্থান নাই। অধিকন্তু, এই যে "কোথাও"—বোধ, এই যে "অন্তর-বাহির" বোধ, এই যে আশঙ্কা বা সন্দেহ যে এরূপ কিছু থাকিতে পারে—এ সকলও তো আমার অন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন অনুভব বা বোধ মাত্র! বিষয় আছে বলিয়া যে তাহা জানি এই ধারণাটাই তো ভুল। আমার জানা বা কল্পনাতেই বিষয়মাত্রের সৃষ্টি—অর্থাৎ ঐ কল্পনার নামই বিষয়—এবং না জানাতেই বা কল্পনার অভাবেই তাহার লয়। আমার অন্তরস্থ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানখণ্ডকেই বা চিৎস্পন্দনকেই তো বিষয় আখ্যা দেওয়া হয়! আমার অতিরিক্ত বিষয় বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

(খ) জ্ঞেয় বলিয়া জগৎ মিথ্যা। জগৎ বলিতে শুধু বাহ্য জগৎ বুঝায় না; দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এ সবই জগতের অন্তর্গত ও মিথ্যা। এবং যাহা যাহা বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য শুধু তাহাই নয়, যাহা কিছু বিশেষণ, অব্যয় বা ক্রিয়াবাচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য তাহাও জগদান্তর্গত ও মিথ্যা। সময় (time), আকাশ বা অবকাশ (space) ও কার্যকারণ ভাব (causation)-এ সকলও—এমনকি সক্রিয় জ্ঞান, অর্থাৎ জানা ক্রিয়াটিও অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যায় জ্ঞেয়, সুতরাং মিথ্যা। সত্য দৃষ্টিতে সৃষ্টি মিথ্যা, স্থিতি মিথ্যা, প্রলয় মিথ্যা; বন্ধন মিথ্যা, মুক্তি মিথ্যা; বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত ভাবও মিথ্যা। জীব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। সুতরাং ঈশ্বরও মিথ্যা। অবশ্য সবই শূন্য তাহা নয়। ইহাদের নামরূপটাই শুধু মিথ্যা—নামরূপের অতিরিক্ত যেটুকু—সেটি আত্মচৈতন্য; তাহা মিথ্যা নহে। জগৎকে আত্মারূপে অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যরূপে গ্রহণ করিলে

তাহা সত্যই। এতক্ষণে আমাদের দৃশ্যের স্বরূপ-নির্ণয় সম্পূর্ণ হইল।

৩০। আমরা প্রথমে দেখিয়াছি যে প্রকৃত আমি বা আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। পরে দেখিলাম যে যাহা অল্প বিচারে আত্মা হইতে পৃথক্ দৃশ্য জগৎ বলিয়া প্রতিভাত হয় পূর্ণ বিচারে বুঝা যায় যে তাহাও প্রকৃতপক্ষে আত্মচৈতন্যই বা আত্মাই। আত্মা হইতেই জগতের উৎপত্তি, আত্মাতেই জগতের স্থিতি এবং আত্মাতেই জগতের লয়। এই বিচারের দ্বারা আমাদের আত্ম-বিষয়ক বিচার সম্পূর্ণ হইল। এখন, শাস্ত্রে ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, যাহাতে জগতের স্থিতি এবং যাহাতে জগতের লয় হয়—তাহার নাম ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মের যাহা যাহা লক্ষণ, আত্মার লক্ষণও ঠিক তাহাই। অর্থাৎ, আমার অন্তরস্থ প্রকৃত আমি বা আত্মা ব্রহ্মই, অপর কিছু নয়। ইহাই অদ্বৈত-বেদান্তের মূল বক্তব্য। এতক্ষণে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় সম্বন্ধে বিচার সম্পূর্ণ হওয়ায় আমাদের জানাও সম্পূর্ণ হইল ; আর কিছু জানিবার থাকিল না।

৩১। আমরা দেখিয়াছি যে জগৎ মিথ্যা, আত্মার কল্পনামাত্র। আত্মার এই জগৎ-কল্পনা ব্যাপারটি যেন দুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমে হয় জীবের কল্পনা—যে কল্পনাতে জীবকে আরও কল্পনাক্ষম বলিয়াই কল্পনা করা হয়। জীব আত্মা হইতে প্রাপ্ত ঐ কল্পনাশক্তির দ্বারা খুঁটিনাটিসহ তাহার নিজস্ব জগৎকে সৃষ্টি করিয়া লয়। আমার স্বপ্নের বা কল্পনার কবি যেমন "তাহার" কল্পনাশক্তির দ্বারা "তাহার" কাব্য রচনা করেন—সেই রকম। কল্পনার দুইটি পর্যায়ই কিন্তু যুগপৎই অনুষ্ঠিত হয়—অর্থাৎ নিজস্ব জগৎ কল্পনাকারীরূপেই জীব কল্পিত হয়। আত্মা, তৎকল্পিত বিভিন্ন জীবের মধ্যে এবং তাহাদের কল্পনার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য কল্পনা করিতে পারেন ; সুতরাং অধিকাংশ মানুষ যে জগৎকে অনেকাংশে একই রূপে

দেখে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। মূল কল্পনাকারী তো একজনই!

৩২। অদ্বৈত বেদান্তের মূল বক্তব্য এই যে প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ-চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ একটি তত্ত্বই শুধু বিদ্যমান্। তাঁহাকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলা যায়। মায়া বা অজ্ঞানবশতঃ সেই এক বস্তুই নানা-রূপে, যথা জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপে অথবা জীব, জগৎ ও ঈশ্বর-রূপে প্রতীয়মান হন। এই অজ্ঞানবশতঃই আমি নিজকে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা সীমিত, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকবলিত, সুখ-দুঃখ-শোক দ্বারা পীড়িত ক্ষুদ্র জীব মাত্র মনে করিয়া নানারূপ দুঃখ ভোগ করি। জ্ঞান দ্বারা ঐ অজ্ঞান নাশ হইলে আমি বুঝিতে পারি যে আমি শুদ্ধ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ; বুঝিতে পারি যে বাহ্যজগৎ, দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি মিথ্যা, তাহারাও শুদ্ধ চৈতন্যই; সুতরাং আমাকে সীমিত বা বন্ধন করিতে পারে এমন কিছুর অস্তিত্বই নাই; বুঝিতে পারি যে আমা হইতেই জগতের উৎপত্তি, আমাতেই জগতের স্থিতি এবং আমাতেই জগতের লয়; অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আমি সেই ব্রহ্মই। জগৎও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বা আত্মচৈতন্যস্বরূপই। সবই সেই এক তত্ত্ব; দ্বিতীয় বস্তু কোথাও কিছু নাই। এই জ্ঞানের উদয়ে সাধক সর্বদা আত্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তিনি সম্পূর্ণ অভয় হন—কারণ তিনি এমন কোনও দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পান না যাহা হইতে ভয় হইতে পারে —বা যাহা হারাইয়া যাইতে পারে। তিনি সম্পূর্ণ নির্বাসন হন—কারণ তিনি এমন কোনও দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পান না যাহা তাহাকে পাইতে হইবে এবং তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও বিশ্রান্ত হন—কারণ তিনি এমন কোনও অবস্থান্তর দেখিতে পান না যাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে। তিনি পরম শান্তির অধিকারী হন।

৩৩। যদিও আত্মা বা ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ও সর্বাধার বলা হইল—তথাপি প্রকৃতপক্ষে তিনি সম্পূর্ণ নির্গুণ ও

বিশেষণবিহীন (অন্যথা তিনি জ্ঞেয়—সুতরাং মিথ্যা হইয়া যান)। উপরোক্ত শব্দগুলির সবই অল্পাধিক—প্রথমটি সর্বাপেক্ষা কম ও শেষটি সর্বাপেক্ষা অধিক—বিশেষণাত্মক ; সুতরাং তাহারা ব্রহ্মকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করিতে পারে না। কোনও বিশেষণই কোনও বিশেষ্যকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না—সম্পূর্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে তো নয়ই। এ সকল শব্দ ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অপরিহার্য পথ-নির্দেশক চিহ্নমাত্র; ঐ পথের যেখানে শেষ বা লক্ষ্য—সেইটাই ঠিক ঠিক ব্রহ্ম। কোনও শব্দের দ্বারাই ব্রহ্মকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না। সেই জন্যই তো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন যে ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু যাহা কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই। মহর্ষি রমণও বলিয়াছেন যে শব্দ নয়—মৌনই ব্রহ্মের ভাষা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩৪। ঠিক ঠিক আমাদের বক্তব্যের বিষয়ীভূত না হইলেও এ বিচারের পথে চলিতে চলিতে আশে পাশে যে দুই একটা জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(ক) প্রথমতঃ, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পার্থক্য বিচার সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনও করিয়াছে ; দ্রষ্টা (বা পুরুষ)কে শুদ্ধ চৈতন্যরূপে নির্ণয়ও করিয়াছে—কিন্তু দৃশ্যের বা আত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তুমাত্রের মিথ্যাত্ব নির্ণয় করিতে পারে নাই ; আর সেই জন্যই বহু পুরুষের অস্তিত্বও স্বীকার করিয়াছে। দৃশ্য বা প্রকৃতির সহিত সংযোগ রূপ বন্ধনকে যাবতীয় দুঃখের কারণ বুঝিয়া, আত্মাকে প্রকৃতি বা দৃশ্য হইতে পৃথক করিয়া সেই আত্মাতেই সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতে উপদেশ করিয়াছে। উহাই এই মতে মুক্তি। কিন্তু আত্মা হইতে পৃথক জগৎ বা তাহার মূল যে প্রকৃতি তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ;

অসংখ্য অন্য পুরুষও রহিয়াছে—এই বিশ্বাস যখন মনে বা অবচেতন মনে রহিয়াই গেল তখন সাংখ্য বা পাতঞ্জল মতাবলম্বীর মুক্তি আত্যন্তিক কি করিয়া হয় তাহা বুঝা যায় না। চিরদিনই মনকে যোগবলে বিষয়চিন্তা হইতে বিরত থাকিবার প্রয়াসের প্রয়োজন থাকিয়া যায়। বিষয় আছে—এই বিশ্বাসটাই তো একটি সূক্ষ্ম বন্ধন! বেদান্তবাদী জ্ঞানী কিন্তু দৃশ্যবর্গের—নিজ আত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তুমাত্রের—মিথ্যাত্ব বুঝিয়া, অর্থাৎ তাহাদিগকেও আত্মস্বরূপ জানিয়া সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া যান। সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগ কিন্তু বেদান্ততত্ত্বে সমারূঢ় হইবার পথে বিশেষ সহায়ক। যোগাভ্যাসের দ্বারা মনকে একাগ্র করিবার শক্তি অর্জন না করিলে অতি সূক্ষ্ম যে বেদান্ত-বিচার, তাহা ধারণা করা যায় না। নিষ্কাম কর্ম এবং ভক্তি বা উপাসনাও চিত্তশুদ্ধিক্রমে বেদান্ততত্ত্ব উপলব্ধির সহায়ক। আর, বিষয়ে বৈরাগ্য সকল মতেই প্রথম ও প্রধান সাধন।

(খ) বাহ্য-জগতের মিথ্যাত্ব বৌদ্ধ ধর্মের শাখা বিশেষেও ("বিজ্ঞানবাদে") স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এ মতের দোষ এই যে ইহাতে উৎপত্তি-বিনাশশীল বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তিকেই (তাঁহাদের ভাষায়, "বিজ্ঞান"কেই) চরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে পরিবর্তনশীল ও দৃশ্য যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা কখনও চরম সত্য হইতে পারে না। তাহারও যে সাক্ষী সেই নির্বিকার আত্মাই চরম সত্য। বৌদ্ধধর্মের আর এক শাখার (মাধ্যমিক) মতে বাহ্য ও আন্তর, সকল বস্তুই আসলে শূন্য। এ মতও যে ঠিক নহে—অবিনাশী পূর্ণস্বরূপ আত্মাই যে চরম সত্য—তাহাও আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। অনেকে বিশ্বাস করেন যে এ সকল মত স্বয়ং বুদ্ধদেবের মত নহে; এ সকল মত তাঁহার পরবর্তীকালের বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত। তাঁহারা মনে করেন যে বুদ্ধদেব স্বয়ং অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং সেই

জন্যই হিন্দুগণের অনেকে তাঁহাকে অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।

(গ) দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অন্য রূপ হইলেও ইহাদের মধ্যে কোনও প্রকৃত বিবাদ নাই। সাধকের চিত্তের অবস্থাবিশেষে তিনটি মতবাদই সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক সাধকই দ্বৈতবাদকেই প্রথমে সত্য বলিয়া মনে করেন ও সেই ভাবে সাধন করেন। চিত্তশুদ্ধির সহিত পরে তাহার মনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং পরিশেষে অদ্বৈতবাদেই চরম সত্য নিহিত বলিয়া বুঝিতে পারেন। অবশ্য এ তিনটি অবস্থা যে একই জন্মে হইবে তাহা নাও হইতে পারে। পূর্ব পূর্ব জন্মের বহু সুকৃতির বলেই সাধক শেষকালে অদ্বৈততত্ত্বের স্বাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন। সাধকের চিত্তের যখন যে অবস্থা তখন তাহার পক্ষে সেই প্রকার সাধনই সার্থক ও কল্যাণকর হয়। যে সাধকের চিত্তে বৈরাগ্যের অভাব বা মান্দ্যভাব রহিয়াছে তাঁহার পক্ষে শুধু বেদান্তবিচারের অভ্যাসে সুফল হইবে না—বরঞ্চ কুফলও ফলিতে পারে। তাঁহার পক্ষে চিত্তশুদ্ধিকর অন্য সাধনই শ্রেয়ঃ। তবে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সাধকের পক্ষেও চরম সত্য হিসাবে অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা কল্যাণকর। অপরপক্ষে অদ্বৈতবাদী সাধকেরও দ্বৈতসাধনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে সকল প্রকার সাধন বা প্রযত্ন এমন কি বেদান্ত বিচারও দ্বৈতরাজ্যেরই ব্যাপার। তিনি যেন একথাও স্মরণ রাখেন যে আত্যন্তিক ভক্তের চিত্তে স্বয়ং শ্রীভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেন—অর্থাৎ, অদ্বৈতজ্ঞান প্রদান করেন। এমনকি সাধকের অন্তরে অদ্বৈততত্ত্বে প্রীতির উদয় এবং অদ্বৈতসাধনের উপযুক্ত বাহ্য পরিবেশ ও সহায়তা লাভও ঈশ্বর কৃপাবলেই হয়। অদ্বৈত জ্ঞান লাভের পরও জ্ঞানীর (যথা, হনুমানের) মন কখনও অদ্বৈত ভাবে, কখনও বিশিষ্টাদ্বৈতভাবে

এবং কখনও বা দ্বৈত ভাবে থাকে; তাহাতে কিছু যায় আসে না।

(ঘ) "প্রমাণ ব্যতীত কিছুই স্বীকার করিব না"—জড়বিজ্ঞানীর এই মনোভাবের সহিত অদ্বৈতবাদীর কোনও বিরোধ নাই। দুঃখের বিষয়, জড়বিজ্ঞানী প্রথম হইতেই নিজের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বসিয়াছেন। কারণ, অনাদি অজ্ঞানবশতঃ জড় জগতের অস্তিত্বকে তিনি বিনা প্রমাণেই স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। যদি তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিয়া জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজিতেন তবে তিনিও অদ্বৈতবাদীই হইয়া যাইতেন। জড়বিজ্ঞানী মানেন যে সকল প্রমাণের শেষ প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষে বা অনুভূতিতে। গণিত বলে, "সকল গাণিতিক যুক্তি-প্রমাণই শেষ পর্যন্ত কয়েকটি সরল মৌলিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বগুলির সত্যতা স্বভাবতঃই এত সুস্পষ্ট যে সেগুলিকে বিনা প্রমাণেই স্বীকার করা হয়। ইহাদের আর প্রমাণ সম্ভব নয়। এই তত্ত্বগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ (axioms) বলা হয়।" যথা, ক ও খ নামক দুইটি বস্তু যদি প্রত্যেকে গ নামক একটি তৃতীয় বস্তুর সমান হয়, তবে ক ও খ পরস্পর সমান। ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য। ইহার আর প্রমাণ সম্ভব নয়। ইহার সত্যতা অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ক ও খ-কে পরস্পর সমান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইলে, জড়বিজ্ঞানী যদি যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ক-কে গ-এর সহিত সমান প্রমাণ করিতে পারেন এবং খ-কেও যদি যুক্তি-প্রমাণ সহায়ে গ-এর সহিত সমান করিতে পারেন—তবে তাহাতেই সন্তুষ্ট হন। তখন তিনি পূর্বোক্ত স্বতঃসিদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলেন যে ক ও খ পরস্পর সমান ইহা প্রমাণিত হইল।

জড়বিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য শাখা সকলও শেষ পর্যন্ত এই সকল স্বতঃসিদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে প্রকৃতপক্ষে নিজের আত্মাই একমাত্র প্রত্যক্ষ বা অনুভূত বস্তু। অন্য কিছুই আমার পক্ষে প্রত্যক্ষ করা

সম্ভব নয়। অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। সুতরাং আত্মা ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুরই অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। অধুনা স্যার জেমস্ জীনস্ প্রমুখ অনেক শ্রেষ্ঠ জড়বিজ্ঞানীও প্রায় এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়াছেন।

(৬) উপরে জড়-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহার পর আর Socialism, Communism প্রভৃতি নানা জাতীয় জড় সাম্যবাদ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ এ সকল মতবাদও—জগৎ সত্য (সুতরাং জাগতিক বস্তুসকলের নানাত্বও সত্য)—এই ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সকল মতাবলম্বীরা নিজদিগকে যুক্তি-বাদী বলিয়া দাবী করেন এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা নিজেরাই কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। ছোটখাট ব্যাপারে যুক্তিবাদী হইয়াও তাহাদের মৌলিক তত্ত্বগুলিকে তাহারা বিনা প্রমাণেই গ্রহণ করিয়াছেন। "সকল মানুষ সমান", "আদর্শের জন্য বা বহু ব্যক্তির কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখ ত্যাগ করিতে হইবে" ইত্যাদি তত্ত্ব তাহারা প্রচার করেন, কিন্তু ইহাদের পক্ষে কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখাইতে পারেন না। নিজের যে আত্মা সেই এক আত্মাই অপর সকল জীবের অন্তরেও প্রতিষ্ঠিত—অদ্বৈতবাদের এই তত্ত্বের উপরই ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য লক্ষিত হয়। তথাকথিত সাম্যবাদীরা তাহাদের গোঁড়ামির জন্য এ কথাটা বুঝিতে চান না। আর বুঝিবেনই বা কিরূপে? জগৎকে সত্য মানিয়া প্রথমেই তাহারা মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। জগৎ যদি সত্য হয় তবে তাহার বৈচিত্র্যও সত্য এবং মানুষে মানুষে ভেদও পারমার্থিক ভাবেই সত্য হইয়া দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে সাম্যবাদ তো মিথ্যাবাদই হইয়া পড়ে। সুতরাং জড়বাদকে স্বীকার করার ফলে জড়-সাম্যবাদীর সাম্যের চেষ্টা কখনও সম্পূর্ণ সফল বা শুভকর হইবে না। অধিকন্তু প্রকৃত সুখ ও শান্তির উৎস কোথায় তাহার সন্ধানও

তাহারা পান নাই। প্রকৃত সাম্যবাদ আধ্যাত্মিকতার উপর—অর্থাৎ একমাত্র অদ্বৈতবাদের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রকৃত সাম্যবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সাম্যবাদেই তত্ত্ব ও প্রয়োগে (between theory and practice) সামঞ্জস্য বিদ্যমান। জড়-সাম্যবাদ যেন প্রাণহীন দেহ।

(চ) এ কথায় কেহ যেন মনে করিবেন না যে আমরা ধনতন্ত্রবাদকে (Capitalism) প্রশংসা করিতেছি। তাহাও ঐ একই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত; অধিকন্তু উহাতে ভেদবুদ্ধির অধিকতর প্রশ্রয় রহিয়াছে। সুতরাং তাহারও ফল অশুভ। যে কোনও মতবাদই "জগৎ ও বিষয় সকলের নানাত্ব বা ভেদ পারমার্থিকভাবেই সত্য"—এই মিথ্যা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাহার পরিপোষক তাহাই মিথ্যা এবং তাহাই দুঃখপ্রদ। বাহ্যজগতের ভোগে প্রকৃত সুখ তো নাই-ই, এমনকি তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত কাল্পনিক—আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু ও আনন্দস্বরূপ—এই মূল সত্যকে অস্বীকার করিলে কি করিয়া প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করা যাইতে পারে? সত্য ও আনন্দ দুইটি পৃথক্ বস্তু নহে—উহারা একই বস্তু; এক আত্মতত্ত্বেরই এই দুইটি নাম। তাই আত্মাকে অর্থাৎ সত্যকে ত্যাগ করিয়া আনন্দ বা সুখ লাভ করা যায় না।

(ছ) অদ্বৈত-বেদান্তই একমাত্র মতবাদ যাহা চরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—যদিও ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিতে এবং বুঝিয়া তাহা সর্বদা দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে ও ব্যবহারে প্রতিফলিত করিতে যে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন হয়, তাহা অর্জন করিবার জন্য, ব্যক্তিগণের চিত্তশুদ্ধির তারতম্যানুসারে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানারূপ দ্বৈতাত্মক সাধন-বিধি হিন্দুশাস্ত্রে অনুমোদিত আছে। বাস্তবিকপক্ষে সকল সাধনই এমনকি অদ্বৈত বেদান্ত বিচারও দ্বৈতজগতেরই অন্তর্ভুক্ত। পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুধর্মের এই মর্মবাণী হিন্দুরা বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদের এই অধঃপতন; তাই হিন্দুসমাজেও এত

কুসংস্কার এবং বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এত কলহ। হিন্দু-ধর্মের মূলতত্ত্ব যে অদ্বৈতবাদ এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সমগ্র হিন্দুজাতির—এমনকি সমগ্র মানবজাতির পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে একদিন অদ্বৈতবাদকেই সমগ্র জগৎ তাহার ধর্মরূপে গ্রহণ করিবে। গোঁড়ামি বর্জিত হইলে অর্থাৎ সত্যে নিষ্ঠা থাকিলে সাধন হিসাবে সকল ধর্মই চিত্তশুদ্ধিক্রমে অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধির দিকেই লইয়া যায়। এই সত্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিল। অপরপক্ষে, সত্যকে বিসর্জন দিয়া শুধু গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত হইলে ধর্ম যে কিরূপ মারাত্মক হইতে পারে—ধর্মের নামে জগতে যে অগণিত পাপ ও হীন কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে—তাহাই তাহার প্রমাণ।

৩৫। (ক) এক্ষণে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে এ অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনায় কি লাভ? তাহার প্রথম ও প্রধান উত্তর এই যে সত্য কি তাহা জানিবার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক—উহা তাহার মজ্জাগত—তাহার অস্তিত্বের সহিত একাকার প্রাপ্ত; কারণ মানুষ স্বরূপতঃ সৎ—অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই। সত্যানুসন্ধিৎসা কোনও লাভ-ক্ষতির উপর নির্ভর করে না। জড়বিজ্ঞানী জড়জগতের সত্যসকল উদ্‌ঘাটনের জন্য কত চেষ্টা, কত কষ্ট স্বীকার করেন—মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

(খ) কিন্তু বেদান্ত-বিচারে যে "লাভ" নাই তাহাও নয়; বরঞ্চ ইহাতেই চরম লাভ। মানুষমাত্রই অসংখ্য প্রকার দুঃখ দ্বারা পরিক্লিষ্ট। তাহার যত কিছু চেষ্টা সে সবই এই দুঃখ হইতে নিস্তার পাইয়া সুখ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আনন্দ বা সুখ তাহার স্বরূপ—তাহার নিজ আত্মাই সুখ-স্বরূপ; সেখানে দুঃখের গন্ধ মাত্র নাই। অজ্ঞানবশতঃ মানুষ জগৎকে সত্য মনে করে, দেহাদিতে আত্মভ্রম করে এবং অজ্ঞানবশতঃই জগৎ হইতে সুখ আহরণ করিবার চেষ্টা করে। কস্তুরী বস্তুটি কস্তুরীমৃগের নিজ নাভিদেশেই থাকে, কিন্তু তাহা না

জানিয়া, বাহিরে সুগন্ধের উৎস খুঁজিতে গিয়া সে বৃথাই অশেষ দুঃখ ভোগ করে। এও ঠিক সেই রকম। আনন্দ যেখানে নাই সেখানে অনুসন্ধান করিলে কি করিয়া আনন্দ মিলিবে? সেই জন্যই তো বহির্মুখ মানব বৈজ্ঞানিক উপায়ে এত বিচিত্র ভোগ্যবস্তুর উদ্ভাবন করিয়াও প্রকৃত সুখলাভ করিতে না পারিয়া হাহাকার করিয়া ঘুরিতেছে ও বাহ্য বস্তু হইতে সুখ আহরণের চেষ্টায় পরস্পরকে হানাহানি করিতেছে। সে হানাহানি এই পারমাণবিক যুগে এমনই মারাত্মক হইতে পারে যে তাহার ফলে সমগ্র মানবজাতি পর্যন্ত জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। অদ্বৈততত্ত্বে একটু বিশ্বাস, একটু শ্রদ্ধা, একটু পরোক্ষ জ্ঞানও (গ্রন্থ হইতে বা শ্রদ্ধেয় কোনও ব্যক্তির বাক্য হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান) যদি জন্মে তবে মানুষ বাহ্য বিষয় ভোগ হইতে চরম সুখ লাভের বৃথা চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবে; অপরকে বঞ্চিত বা ধ্বংস করিয়া নিজের সুখ লাভের নিষ্ফল প্রযত্ন হইতে বিরত হইবে। অন্তরের দিকে দৃষ্টি পড়িলে ব্যক্তিগণ ক্রমে শান্ত ও সুখী হইবে এবং ব্যক্তিগণ যদি শান্ত ও সুখী হন তবে জাতিগণ এবং জগৎও ক্রমে শান্ত ও সুখী হইবে।

(গ) আর বিরল যে ব্যক্তি এ তত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝিয়া অর্থাৎ অপরোক্ষ বা উপলব্ধি করিয়া তাহা সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন—তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবেন। কোনও দুঃখ, কোনও ভয়ই তাহার নাই—সর্বদা আনন্দস্বরূপ আত্মাতে অবস্থিত বলিয়া তিনি সদানন্দ। শত্রু, মিত্র—সকলেই তাঁহার নিকট নিজের আত্মাই। মান, অপমান; সুখ, দুঃখ; জনপদ, বিজন বন; কর্ম-চঞ্চলতা, নিঃস্তব্ধ অবসর; জন্ম, মৃত্যু—সবই তাঁহার নিকট নিজ আত্মানন্দসাগরের বিভিন্ন তরঙ্গমাত্র। সবই আনন্দময়।

(ঘ) আর অতি বিরল যিনি এ তত্ত্বে একেবারে ডুবিয়া যাইবেন তাঁহার নিকট জগৎ নাই—শুধু ব্রহ্মই আছেন। তিনি তো ব্রহ্মই হইয়া যাইবেন। তাঁহার অবস্থা বাক্য-মনোতীত।

তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্নতর অবস্থা দ্বারা ঐ অবস্থা কিঞ্চিৎ অনুমান-যোগ্য মাত্র। উহাই সুখ বা শান্তির চরম সীমা।

৩৬। (ক) এ সকল উচ্চাঙ্গের কথা ছাড়িয়া যদি জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথাই মাত্র চিন্তা করা যায়, তবে সেখানেও দেখা যাইবে যে ব্যক্তিগত ও জনজীবনে যাহা কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর তাহাই মূলতঃ অদ্বৈততত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা কিছু সদাচার বলিয়া সকল সম্প্রদায়ে, সকল সমাজে ও সকল রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে সর্ববাদিক্রমে স্বীকৃত তাহাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অদ্বৈততত্ত্বে পঁহুছিবার সাধন। মানুষ সুখ বা আনন্দ-লাভের উদ্দেশ্য ভিন্ন একটি পদক্ষেপও করে না (দুঃখ বর্জনের চেষ্টাও সুখলাভের চেষ্টারই অন্তর্গত) এবং কোনও জাগতিক সুখেই সে তৃপ্ত নয়; আরও সুখ—অনন্ত সুখই সে চায়। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে মানুষ যাহা কিছু করে তাহা অনন্ত সুখস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মকে পাইবার জন্যই করে। ছোট বা খণ্ড সুখও আত্মারই আংশিক প্রকাশ ভিন্ন অপর কিছু নয়। আবার, মানুষের কৌতূহল বা জানিবার ইচ্ছারও শেষ নাই; কোনও খণ্ডজ্ঞানেই সে তৃপ্ত নয়—সে আরও জানিতে চায়, কারণ জ্ঞানই তাহার স্বরূপ, তাহার আত্মা। অসীম, অনন্ত, চিৎসাগররূপ আত্মার সাক্ষাৎকারের পূর্বে তাহার জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হইবার নয়। জগতে যাহা কিছু বিষয়জ্ঞান বা খণ্ডজ্ঞান তাহা ঐ জ্ঞানসাগরেরই বিভিন্ন তরঙ্গমাত্র। আবার, মানুষের দীর্ঘজীবী বা অমর হইবার আকাঙ্ক্ষাও অদম্য কারণ সে প্রকৃতপক্ষে অজর অমর আত্মাই। আরও দেখা যায়, মানুষ যে ধনে, জনে, সম্পদে, ক্ষমতায়, মানে, যশে বড় হইতে চায়, সে আকাঙ্ক্ষারও কোনও অবধি নাই, কারণ, অজ্ঞানবশতঃ সে নিজকে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ জীব মনে করিলেও সে যে স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, সমগ্র বিশ্ব যে তাহা হইতেই উৎপন্ন, তাহাতেই স্থিত এবং প্রলয়কালে তাহাতেই লয় হয়—এ অদ্বৈতজ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় না; অবচেতন মনে থাকিয়া, অজ্ঞানের

আবরণ ভেদ করিয়া তাহা অবিরতই অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করে। মানুষ যে শুধু নিজের নয়, অপরের কল্যাণও কামনা করে—তাহারও কারণ ঐ অদ্বৈততত্ত্বই। সাধারণ মানুষও অজ্ঞাতসারে অল্পাধিক অনুভব করে যে তাহার নিজের আত্মা ও অপরের আত্মা মূলতঃ এক। অর্থাৎ, সকল মানুষই, সকল সময়ে, সকল কর্মে, জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, ঐ সত্তাস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও সর্বাধার আত্মা বা ব্রহ্মেরই সন্ধানে চলিয়াছে—কারণ উহাই তাহার স্বরূপ, স্বধাম। সেখান হইতে বিচ্যুত হইলেও, অর্থাৎ অজ্ঞানে উহা আংশিকভাবে আবৃত থাকিলেও তাহার স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ঐ নিজধামে পৌঁছানর পূর্বে তাহার বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই। অজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় তাহার পথে চলিতেছে, তাই ঐ গন্তব্যে পৌঁছিতে পারিতেছে না। অদ্বৈতবাদ তাহাকে চক্ষুদান করে; তাহার গন্তব্যে পৌঁছিতে সহায়তা করে।

(i) দৃষ্টান্তে আসা যাউক। সত্য কথা বলা এবং ব্যবহারে সত্য পালন করাকে সকলেই ভাল কাজ বলিয়া স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহার কারণ কি? মিথ্যা কথা বলিলে বা প্রবঞ্চনা করিলে যদি আমার (সাংসারিক) "লাভ" হয় তবে তাহা করিব না কেন? অপরপক্ষে, সত্যাচরণ করিতে গিয়া যদি আমার (সাংসারিক) "ক্ষতি" হয় তবে তাহা করিব কেন? ইহার সঠিক উত্তর শুধু অদ্বৈতবাদই দিতে পারে। কারণ, ছোট খাট, স্থূল ব্যাপারে সাধারণ হিসাবে যাহা সত্য বলিয়া পরিচিত, দীর্ঘকাল, নিরন্তর তাহার অভ্যাস না করিলে অদ্বৈততত্ত্বের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সত্য বা তত্ত্ব এক মুহূর্তের বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায়ও ধারণা করিবার শক্তি জন্মে না, নিরন্তর তাহা ধারণা করা তো অতি দূরের কথা। অথচ দৃঢ়, অদ্বৈতজ্ঞান ব্যতিরেকে প্রকৃত বা স্থায়ী সুখ বা শান্তি লাভ হয় না। তাই কথায় ও কাজে সত্যপালন অদ্বৈত-তত্ত্বেরই সাধন।

(ii) পরের জন্য, সমাজের জন্য, বা দেশের জন্য বা অন্য

কোনও উচ্চ আদর্শের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াকে সকলেই মহৎ কাজ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু কেন? কেন আমি পরের অনিষ্ট করিয়াও নিজ স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব না? অদ্বৈতবাদই শুধু ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে। কারণ, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয় যে নিজের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার যেরূপ নিজ চিৎ-স্বরূপ আত্মার একটি তরঙ্গ ও উপতরঙ্গের সমষ্টি মাত্র, সেইরূপ অন্যের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও সেই এক আত্মারই অপর একটি তরঙ্গ ও উপতরঙ্গের সমষ্টি। সাগরের যেমন নিজের একটি তরঙ্গ অপেক্ষা অপর তরঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্ম বা আত্মচৈতন্যের সহিত একীভূত দৃঢ় অদ্বৈতজ্ঞানীও অপরের দেহ, প্রাণাদি অপেক্ষা নিজ দেহ, প্রাণাদিকে আপনতর মনে করেন না। তাঁহার নিকট সকল দেহই নিজের দেহ, সকল প্রাণই নিজের প্রাণ, সকল মনই নিজের মন।

(iii) সরলতাও একটি সদ্‌গুণ বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। ইহার বিপরীত যে কুটিলতা, তাহাকে কেহ ভাল বলে না। এই সরলতাও সত্যের সাধন বা তাহার ফল ব্যতীত আর কিছু নয়। দীর্ঘকাল সত্যের সাধনা করিলে মানুষ স্বভাবতঃ সরল হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন যে মানুষ শেষ জন্মে সরল হয়।

(iv) ভয় জিনিসটা সর্বত্র নিন্দিত এবং নির্ভিকতা সর্বত্র প্রশংসিত। তাহার কারণ কি? কেন আমি দুঃখ বা মৃত্যুকে ভয় করিব না? অদ্বৈতবাদ ইহার উত্তর দিয়া বলে যে দুঃখ বা মৃত্যু বা অন্য কোনও ভয়ের কারণ বাস্তবে নাই; যেহেতু অভয়-স্বরূপ আত্মার অতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই।

(v) যিনি সুখে ও দুঃখে, লাভে ও ক্ষতিতে বা স্তুতিতে ও নিন্দায় বিচলিত হন না; শত্রুতে ও মিত্রে যাঁহার সমান প্রীতি এরূপ ব্যক্তি সর্বত্র সমাদৃত। কিন্তু কেন? কেন আমি সুখে,

লাভে বা স্তুতিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিব না? কেনই বা আমি দুঃখে, ক্ষতিতে বা নিন্দায় বিমর্ষ হইব না? কেন আমি মিত্রকে স্নেহ ও শত্রুকে দ্বেষ করিব না? এ সকল প্রশ্নের চরম উত্তর শুধু অদ্বৈতবাদীই দিতে পারেন। তিনি বলেন, এ সকলকে আপাত-দৃষ্টিতে বিপরীতভাবাপন্ন বস্তু বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে সকলই বিভিন্ন অনুভব মাত্র—অর্থাৎ একই চৈতন্য সাগরের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ মাত্র। জ্ঞানী ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন।

এক কথায়, দেহাদিতে "আমি" ও "আমার" রূপ বোধই মানুষকে একটি মাত্র দেহে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে সঙ্কীর্ণচেতা ও স্বার্থপর করিয়া তুলে এবং উহা হইতেই লোকের যাবতীয় নীচ ও কুকর্মে প্রবৃত্তি হয়। এই দেহাত্মবোধ অর্থাৎ নিজ দেহকে প্রকৃত আমি বা আত্মা বলিয়া ভুল করাই যাবতীয় অনর্থের মূল। অদ্বৈতবোধ সকল অনর্থের মূল এই দেহাত্মবোধকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়। অপরপক্ষে যে কোনও আচরণই মানুষকে উদারচেতা করে, ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বহুকে আপন মনে করিতে সাহায্য করে, তাহাই অদ্বৈততত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইবার একটি নিশ্চিত পদক্ষেপ—তাহা বুদ্ধিপূর্বক হউক বা অবুদ্ধিপূর্বকই হউক। তবে বুদ্ধিপূর্বক হইলে যাত্রাটি অধিকতর সহজ ও মধুর হয় এবং ভুল ভ্রান্তির দ্বারা পথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। তাই অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেহাত্মবোধের উৎপত্তি অজ্ঞান হইতে এবং একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই তাহাকে নাশ করা সম্ভব।

(খ) (i) অদ্বৈতবাদ আলস্যের প্রশ্রয় দেয় না বা সকলকেই কর্ম ত্যাগ করিতে বলে না। অদ্বৈততত্ত্বের চরম পরিপাকে যখন এক সমরস চিদানন্দসাগরস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও বস্তুর অনুভবই হয় না, তখন অবশ্য আপনা হইতেই কর্ম ত্যাগ হইয়া যায়

বটে, কিন্তু সেরূপ ব্রহ্মীভূত জ্ঞানী ব্যক্তি চিরদিনই অতি বিরল। অপর সকলকেই অধিকারীভেদে নানারূপ কর্ম করিতে হয়। অদ্বৈত তত্ত্বের ন্যায় সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণা করিতে হইলে যে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন হয় তাহা বহু জন্ম জন্মান্তরব্যাপী দীর্ঘকাল নিরলসভাবে নিজ কর্তব্য কর্ম করিতে করিতেই অর্জন করা সম্ভব; অকালে কর্ম ত্যাগ দ্বারা নহে। এজন্য ব্রহ্মশাস্ত্রেও অধিকারীভেদে নানারূপ কর্ম ও উপাসনার বিধান রহিয়াছে। নিম্ন অধিকারীর পক্ষে সকাম কর্ম বিধেয়। উহার অভিজ্ঞতা হইতেই জীব প্রাণে প্রাণে এই শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারে যে কর্ম দ্বারা লভ্য যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তাহা হইতে উৎপন্ন সুখ অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক ও দুঃখমিশ্রিত। তখনই মাত্র সে বিষয়ে বৈরাগ্য বোধ করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর ঐ সাধকের জন্য ঈশ্বর প্রীতির উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার বিধান। অতীব নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকাল এই ভাবে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা করিতে করিতে যখন মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম ও নির্মল হয়, তখন সাধকের অদ্বৈত তত্ত্বের আলোচনার অধিকার বা যোগ্যতা জন্মে। কর্তব্য কর্মের মধ্যেও আবার কোনও কর্ম বড় বা কোনও কর্ম ছোট নয়। পূজা-অর্চনা হউক, রাজকার্য্য হউক, যুদ্ধবিগ্রহ হউক, কৃষি-বাণিজ্য হউক বা সেবাদি বা অন্য যে কোনও কর্মই হউক, নিজ নিজ কর্ম যদি পূর্বোক্ত মনোভাব লইয়া যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হয়, তবে তাহাই চিত্তশুদ্ধিক্রমে অদ্বৈত জ্ঞান লাভের যোগ্যতার কারণ হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদ সমাজ-স্থিতিরও বিরোধী নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অকালে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহার নিজ কর্তব্য কর্ম যে ঘোরতর যুদ্ধ—উপযুক্ত মনোভাবসহকারে তাহাই করিয়া যাইতে উপদেশ করিয়াছিলেন।

(ii) অদ্বৈতবাদ অবশ্য বলে যে জীবনের চরম লক্ষ্য কর্ম নয়; শান্তি বা পরম বিশ্রান্তিস্বরূপ ব্রহ্মই সেই লক্ষ্য স্থল। কিন্তু

অদ্বৈতবাদ ইহাও শিক্ষা দেয় যে কর্মই চিত্তশুদ্ধিক্রমে সেই শান্তি, বিশ্রান্তি বা নৈষ্কর্ম্য লাভের উপায়। এই তত্ত্বেরই আংশিক অনুভবে আধুনিক জড় সাম্যবাদীরাও অর্থকেই শ্রমিকের কর্মের একমাত্র পুরস্কার বলিয়া মনে করেন না; শ্রমিকের শ্রমের পুরস্কার হিসাবে উপযুক্ত অবসর ও বিশ্রামেরও দাবী করেন। শ্রমই যেমন অবসর বা বিশ্রাম অর্জন করিবার উপায়, তেমনই জন্মজন্মান্তরব্যাপী কঠোর সাধনার ফলেই পরিশেষে পরম বিশ্রান্তিস্বরূপ ব্রহ্মনির্বাণ বা নৈষ্কর্ম্য অর্জিত হয়। কর্মীগণের মধ্যে যাহারা অদ্বৈততত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাষমাত্রই লাভ করিয়াছেন তাহারা যে শান্তমনা হইয়া নিজ নিজ কর্ম আরও তৃপ্তির সহিত, আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবেন—তাহাও বুঝা কঠিন নয়।

অপরোক্ষ জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠ হইবার পর অবশ্য জ্ঞানীর পক্ষে আর কোনও কর্ম করিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু তখন কর্ম ত্যাগ করিতেই হইবে এমন কোন নিয়মও নাই। বস্তুতঃ অনেক জ্ঞানী লোকশিক্ষা বা অন্য কোনও প্রকার লোকহিতকর কর্ম লইয়া থাকেন। আর যে জ্ঞানী উহা না করিয়া সদা সর্বদা সমাহিতই থাকিতে চান—তাঁহার অবস্থিতি মাত্রই সমাজের পক্ষে পরম কল্যাণকর। তাঁহার সান্নিধ্য লোকের মনে বল ও শান্তি দান করে এবং চিত্ত নিরুদ্বেগ হওয়ার ফলে তাঁহারা নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম অধিকতর পরিমাণে ও অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন।

(গ) (i) অদ্বৈতবাদ লোককে সুখ লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে বলে না; বরঞ্চ অধিকতম সুখ লাভ কিসে হয় তাহারই সন্ধান দেয়।

(ii) অদ্বৈতবাদ স্বার্থান্বেষণ করিতেও বারণ করে না—বরং তাহাই করিতে বলে। তবে প্রকৃত স্ব ও স্বার্থ কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দেয়। শিক্ষা দেয় যে সমগ্র মানবজাতি, সমস্ত পশু, পক্ষী,

কীট, পতঙ্গ—সমগ্র বিশ্বে যাহা কিছু আছে সবই স্ব-এর অন্তর্গত। স্ব-এর বাহিরে কোথাও কিছু নাই।

৩৭। প্রসঙ্গক্রমে পাঠক একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে একদিকে যেমন অদ্বৈতবাদই একমাত্র "সনাতন" তত্ত্ব যাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম কোনও যুগে কোনও কালে সম্ভব নয়, অপর দিকে তেমনই ইহা একটি চরম বৈপ্লবিক তত্ত্ব। প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা অপেক্ষা অত্যন্ত পৃথক ও সাহসী মতবাদকেই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বলা যায়। কিন্তু যে চিন্তা-বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে সাধারণ লোকে যে বিশ্বজগৎকে এত সত্য বলিয়া মনে করে সেই বিশ্বজগৎটাই মিথ্যা এবং জন-সাধারণ যাহার অস্তিত্বেরই খবর রাখে না, সেই আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, সে বিচার-সিদ্ধান্ত যে কী ভীষণ দুঃসাহসিক ও বৈপ্লবিক তাহা আর বলিতে হইবে না। প্রচলিত অর্থে যিনি বিপ্লবী তাঁহার সাহস ও চিত্তের দৃঢ়তা দেখিয়াই লোকে বিস্ময়ান্বিত হয়; তখন প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞানীর ত্যাগ, সাহস ও চিত্তের দৃঢ়তা যে কি পরিমাণ তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আচার্য গৌড়পাদ, আচার্য শঙ্কর প্রভৃতিকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বলিতে হয়। আরও পূর্ব পূর্বযুগে আমাদের প্রাচীন ঋষিরাও অবশ্য এই বৈপ্লবিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু সম্ভবতঃ তখন তাঁহাদিগকে এমন প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয় নাই। বর্তমান জড়বিজ্ঞানপ্রধান যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে অতীব প্রতিকূল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু এ যুগেও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় বীর বিপ্লবী সন্ন্যাসী একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় জড়বিজ্ঞানের ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহবিক্রমে অদ্বৈত-তত্ত্বের ধ্বজা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈত-তত্ত্বের নিজস্ব শক্তিই তাঁহার এই সাফল্যের মূল কারণ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার পরবর্তীকালে অবশ্য সোসিয়ালিজ্‌ম্, কমিউনিজম

প্রভৃতি জড় সাম্যবাদ বহু মানব মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে ও করিতেছে, কিন্তু জড় বিজ্ঞানবাদই যখন মৌলিক তত্ত্বহিসাবে অদ্বৈতবাদের নিকট পরাজিত, তখন জড় সাম্যবাদকে পরাভূত করিয়া তৎস্থলে অদ্বৈতবাদ রূপ প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ হইলেও অসম্ভব কার্য নহে। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধিক্রমে যাহারা অদ্বৈততত্ত্বে আরোহণ করিবার সোপানস্বরূপ, সেই সকল প্রচলিত ব্যবহারিক ধর্মজগতের প্রায় সর্বস্থলেই এত কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে এবং ধর্মধ্বজীদিগের মধ্যে প্রায়শঃ এত অজ্ঞতা, নীচতা, স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্ম বস্তুটাই এখন লোকের নিকট—বিশেষতঃ তরুণদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। ইহার প্রতিকারের আশু প্রয়োজন। ধর্মরাজ্যের এই আবর্জনারাশির দহনকার্যও অদ্বৈত-জ্ঞানাগ্নির দ্বারাই সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পণ্ডিতগণের কূট তর্কজালের আশ্রয় না লইয়া সাধারণ সরল বিচারবুদ্ধি দ্বারাই যে অদ্বৈততত্ত্বের সারমর্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়, ইহাই দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ বিচারের সহায়ে আমরা অদ্বৈত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সরল হইলেও তাহাতে কোনও দুর্বলতা বা ফাঁক কোনও সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকই দেখিবেন না বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু এ তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম; কারণ, আত্মা অন্য বিষয়ের ন্যায় ইন্দ্রিয় বা মনোগ্রাহ্য কোনও বিশেষ চিহ্ন দ্বারা জ্ঞেয় নন। সুতরাং আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে এ ব্যাপারে কোনও ভুল-ভ্রান্তি হইল কি না এরূপ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। সুতরাং পূর্বোক্ত বিচার ধারা যে শুধু আমাদের স্বকপোলকল্পিত নয়, পূর্ব পূর্ব যুগের ত্যাগী, শুদ্ধ-চিত্ত তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন অদ্বৈতবাদী মনীষীরাও যে ঐরূপ বিচার করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে উক্ত বিচার ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা আরও দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারি। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহারা কি বলিয়াছেন তাহার সন্ধান করা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অদ্বৈতবাদী মনীষীদের মধ্যে আচার্য শঙ্করের নাম ও প্রতিভা সর্বাধিক পরিচিত। তিনিও আবার তাঁহার পরম গুরু আচার্য গৌড়পাদের ভাবধারাকেই সমর্থন ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ আচার্য শঙ্কর ও আচার্য গৌড়পাদের এবং অল্পতঃ অপর কয়েকজন অদ্বৈতবাদী মনীষীর বক্তব্যের কিছুটা উদ্ধৃত করা হইল।

১। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; এ বিষয়ে :—

দৃগ্-দৃশ্যৌ দ্বৌ পদার্থৌ স্তঃ পরস্পরবিলক্ষণৌ।
দৃগ্ ব্রহ্ম দৃশ্যং মায়েতি সর্ববেদান্তডিণ্ডিমঃ॥

—শঙ্কর : ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা : ১৮

অর্থাৎ, যাবতীয় পদার্থ দুই প্রকারেরই হয় ; এক দৃক্ বা দ্রষ্টা ; অপর দৃশ্য। (বিচার করিলে দেখা যায় যে) তাহাদের মধ্যে দৃক্ বা দ্রষ্টা ব্রহ্মই এবং দৃশ্য বা জগৎপ্রপঞ্চ মায়ামাত্র—অর্থাৎ, আছে বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র কিন্তু বাস্তবে নাই। ইহাই সকল বেদান্তের সারতত্ত্ব।

২। আত্মা যে শুদ্ধবোধস্বরূপ, সকল দৃশ্যের দ্রষ্টা বা সাক্ষী এবং তিনি যে অপর কাহারও দৃশ্য নন ; এ বিষয়ে ঃ—

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয়লম্বনঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ॥ ১২৫
যো বিজানাতি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসদ্ভাবমভাবমহমিত্যয়ম্॥ ১২৬
যঃ পশ্যতি স্বয়ং সর্বং যং ন পশ্যতি কশ্চন।
যশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদিং ন তদ্ যং চেতয়ত্যয়ম্॥ ১২৭
অহঙ্কারাদিদেহান্তা বিষয়াশ্চ সুখাদয়ঃ।
বেদ্যন্তে ঘটবদ্ যেন নিত্যবোধস্বরূপিণা॥ ১৩০
অহঙ্কারাদিবিকারাস্তে তদভাবোঽয়মপ্যনু।
সর্বে যেনানুভূয়ন্তে যঃ স্বয়ং নানুভূয়তে।
তমাত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া॥ ২১৪

—শঙ্কর ঃ বিবেকচূড়ামণি

অর্থাৎ, এমন একজন আছেন যিনি নিজ সত্তায় সত্তাবান্ অর্থাৎ যাঁহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ যাঁহার অস্তিত্ব অপর কাহারও জানার উপর নির্ভর করে না ; যিনি সর্বদা বিদ্যমান্ ; যাঁহার আশ্রয়ে, অর্থাৎ যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া "আমি" এই প্রকার প্রত্যয় উদিত হয় ; যিনি দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি হইতে এবং যে ক্ষেত্রে আনন্দ অনুভূত হয় সেই আনন্দময় কোশ হইতেও পৃথক ; যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার সাক্ষী, অর্থাৎ যিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে

বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্ব এবং সুষুপ্তিকালে তাহাদের অভাব লক্ষ্য করেন ও "আমি, আমি" এই প্রকার জ্ঞানেরও যিনি সাক্ষী; যিনি নিজে সকল বিষয় দর্শন করেন কিন্তু যাঁহাকে অপর কেহ বিষয়রূপে দেখিতে পায় না; চৈতন্যস্বরূপ যাঁহার প্রতিফলনে বুদ্ধি প্রভৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়; যিনি অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল দেহ পর্যন্ত সব কিছু, বাহ্য বিষয়সকল এবং সুখ দুঃখাদিকেও একটা ঘটের মতই দৃশ্য রূপে জানেন; যিনি নিত্যবোধ-স্বরূপ; অহঙ্কার হইতে সুরু করিয়া (মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহ, বাহ্য জগৎ প্রভৃতি) যাবতীয় বিকারশীল পদার্থসমূহের (জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে) প্রকাশ এবং (সুষুপ্তি ও সমাধিতে) তাহাদের অভাব বা অপ্রকাশ যাঁহার দ্বারা অনুভূত হয় অথচ যিনি নিজে অপর কাহারও অনুভবের বিষয় হন না, সকল বিষয়ের সেই বিজ্ঞাতাকেই তুমি সুসূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে নিজের আত্মা বলিয়া জানিবে।

৩। আত্মার আনন্দস্বরূপতা বিষয়ে ঃ—

(ক) আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।
স্বত এব হি সর্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ।
তত আত্মা সদানন্দো নাস্য দুঃখং কদাচন॥ ১০৬
যৎ সুষুপ্তৌ নির্বিষয় আত্মানন্দোঽনুভূয়তে।
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চ জাগ্রতি॥ ১০৭
—শঙ্কর ঃ বিবেকচূড়ামণি

অর্থাৎ, নিজের প্রয়োজনেই অপর বিষয়সকল প্রিয় বলিয়া বোধ হয়; তাহাদের নিজস্ব প্রিয়ত্ব বলিয়া কিছু নাই। অধিকন্তু আত্মাই সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম। সুতরাং আত্মা সদানন্দ; তাঁহার কখনও কোনও দুঃখ নাই। (আত্মা আনন্দস্বরূপ বলিয়াই) সুষুপ্তি-কালে বিষয়শূন্য আত্মানন্দ অনুভূত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই চতুর্বিধ প্রমাণ রহিয়াছে।

(খ) ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষতে ॥ ৮
বিদ্যারণ্য ঃ পঞ্চদশী ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থাৎ, এই (জ্ঞানস্বরূপ) আত্মা পরমানন্দস্বরূপ, কেননা ইনিই পরম প্রেমের আধার। নিজের অস্থায়ীত্বে অনিচ্ছা এবং স্থায়ীত্বে ইচ্ছাই—আত্মপ্রেমের, অর্থাৎ আত্মাই যে প্রিয়তম তাহার পরিচায়ক।

৪। আত্মা আনন্দস্বরূপ হইলেও আত্মানন্দ যে অনাত্মবস্তুর অনুভবের সহিত মিশ্রিত থাকায় সর্বদা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে পারে না ; এ বিষয়ে ঃ—

অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ।
ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥ ১২
তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ ॥ ১৪
—বিদ্যারণ্য ঃ পঞ্চদশী ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থাৎ, ছাত্রমণ্ডলী (উচ্চৈঃস্বরে) পাঠ করিতেছে। সেই ছাত্রগণের মধ্যে নিজের পুত্র থাকিলে তাহার অধ্যয়ন শব্দ (সামান্যতঃ শব্দরূপে) জ্ঞাত হইলেও (ইহা পুত্রের অধ্যয়ন শব্দ—এইরূপ বিশেষ রূপে) জ্ঞাত হয় না। বিশেষভাবে জ্ঞানের বাধা থাকাতেই ঐরূপ ঘটে। ইহার কারণ নানারূপ সদৃশ শব্দের সম্মিলন। আর পরমানন্দস্বরূপ আত্মার পরানন্দভাবের অনুভবে যে বাধা বিদ্যমান্, ভ্রান্তির একমাত্র প্রসূতি অনাদি অবিদ্যাই তাহার কারণ।

৫। দৃশ্যবর্গের যে আত্মা হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই—অর্থাৎ তাহারা যে আত্মাতেই অবস্থিত ; এ বিষয়ে ঃ—

(ক) স্বপ্নদৃক্ প্রচরণ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥ ৬৩

স্বপ্নদৃক্‌চিত্তদৃশ্যান্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্‌।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্‌-চিত্তমিষ্যতে॥ ৬৪
চরণ্‌ জাগরিতে জাগ্রদ্‌ দিক্‌ষু বৈ দশসু স্থিতান্‌।
অণ্ডজান্‌ স্বেদজান্‌ বাপি জীবান্‌ পশ্যতি যান্‌ সদা॥ ৬৫
জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্‌।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে॥ ৬৬
—গৌড়পাদ ঃ মাণ্ডুক্য-কারিকা ঃ অলাতশান্তিপ্রকরণ

অর্থাৎ, স্বপ্নদর্শনকারী ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় পর্যটন করিতে করিতে দশ দিকে অবস্থিত অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি যে সমস্ত জীবকে (এবং অন্যান্য যাহা কিছু) সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন, সে সকলই স্বপ্নদর্শীর চিত্তদৃশ্যমাত্র এবং ঐ চিত্ত হইতে কোনও পৃথক্‌ সত্তা তাহাদের নাই। এইরূপ, স্বপ্নদর্শীর চিত্তও আবার শুধু সেই স্বপ্নদর্শীরই দৃশ্য ; সুতরাং স্বপ্নদর্শী হইতে পৃথক্‌ অস্তিত্ব তাহার নাই। ঠিক সেইরূপ, জাগ্রৎ ব্যক্তিও জাগ্রদবস্থায় পর্যটন করিতে করিতে যাহা কিছু জীব (বা অন্য বস্তু) দর্শন করেন সে সকল তাহার চিত্তদৃশ্যমাত্র ; সুতরাং তাহাদের অস্তিত্ব সেই চিত্তের অতিরিক্ত নহে। ঐ চিত্তেরও, তাহার যে দ্রষ্টা, সেই আত্মার অতিরিক্ত কোনও পৃথক্‌ সত্তা নাই।

(খ) অন্তস্থানাত্তু ভেদানাং তথা জাগরিতে স্মৃতম্‌।
যথা তত্র, তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে॥ ৪
স্বপ্নজাগরিতস্থানে হ্যেকমাহুর্মনীষিণঃ।
ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা॥ ৫
—গৌড়পাদ ঃ মাণ্ডুক্য-কারিকা ঃ বৈতথ্য প্রকরণ

অর্থাৎ, স্বপ্ন যে মিথ্যা তাহা বলিবার কারণ এই যে স্বপ্নে যে বৈচিত্র্য-পূর্ণ বাহ্য জগৎ দৃষ্ট হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে বাহিরে নাই—উহা স্বপ্নদ্রষ্টার অন্তরেই অবস্থিত। সেই একই কারণে—জাগ্রজ্জগৎ,

জাগ্রৎকালে, স্বাপ্নিক জগৎ অপেক্ষা অধিকতর স্থানব্যাপী বলিয়া মনে হইলেও সেই জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জগৎও মিথ্যা—কারণ উহারও অস্তিত্ব দ্রষ্টার অন্তরেই। এই সুপ্রসিদ্ধ কারণেই স্বপ্নে ও জাগরণে দৃষ্ট বৈচিত্র্যময় জগৎকে সমপর্যায়ভুক্ত করিতে হয়; সুতরাং স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা প্রকৃতপক্ষে একই প্রকার।

(গ) রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দৃক্ তু মানসম্।
দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে॥

—শঙ্কর ঃ বাক্যসুধা—১

অর্থাৎ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল দৃশ্য বা জ্ঞেয় এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা; (সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের অতিরিক্ত বাহ্য বিষয় বলিয়া কিছু নাই—ইহাই মর্মার্থ)। সেই ইন্দ্রিয়বর্গও কিন্তু দৃশ্য এবং মন তাহাদের দ্রষ্টা; (সুতরাং বাহ্য জগৎ যাহাতে অবস্থিত সেই ইন্দ্রিয়গণেরও মনের অতিরিক্ত কোনও বাস্তব সত্তা নাই।) অন্তঃকরণবৃত্তিগণও আবার দৃশ্য এবং সাক্ষী বা প্রত্যক্ চৈতন্যই তাহাদের দ্রষ্টা, (সুতরাং মনও প্রত্যগাত্মার অতিরিক্ত কোনও পৃথক্ বস্তু নয়)। দ্রষ্টা বা সাক্ষী বা প্রত্যগাত্মা কিন্তু আর কাহারও দৃশ্য নন; (সুতরাং তাঁহার সত্তা তাহার নিজস্ব—তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু; বাহ্য ও আন্তর যাবতীয় দৃশ্যবর্গ তাহাতেই বিধৃত—ইহাই মর্মার্থ।)

(ঘ) মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥ ৩১

—গৌড়পাদ ঃ মাণ্ডূক্য-কারিকা ঃ অদ্বৈত-প্রকরণ

অর্থাৎ, দৃশ্যমান্ চরাচরাত্মক যাহা কিছু দ্বৈত, সে সমস্তই মনঃস্বরূপ। অর্থাৎ, মনের অতিরিক্ত জগতের কোনও সত্তা নাই। কারণ, (সুষুপ্তি বা সমাধিকালে) যখন মন থাকে না (অ-মন হইয়া যায়) তখন দ্বৈতেরও উপলব্ধি হয় না।

(ঙ) স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা
ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মন এব সর্বম্।
তথৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষ
স্তৎ সর্বমেতন্ মনসো বিজৃম্ভনম্॥ ১৭০
মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্
স্থূলাত্মনা সূক্ষ্মতয়া চ ভোক্তৃঃ।
শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্
গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিত্যম্॥ ১৭৭
যদি সত্যং ভবেদ্ বিশ্বং সুষুপ্তাবুপলভ্যতাম্।
যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোঽসৎ স্বপ্নবন্ মৃষা॥ ২৩৪
—শঙ্কর ঃ বিবেকচূড়ামণি

অর্থাৎ, স্বপ্নকালে দৃষ্ট বাহ্য জগৎ ও তাহার ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান্ থাকে না; মনই নিজ শক্তি দ্বারা তাহা সৃষ্টি করিয়া লয়। জাগ্রৎকালেও ঠিক ঐরূপই হইয়া থাকে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যে কোনও পার্থক্যই নাই। সুতরাং স্বপ্নে বা জাগরণে যাহা কিছু দেখা যায় সে সকল মনেরই বিস্তার মাত্র। শরীর, বর্ণ, আশ্রম, জাতি ইত্যাদি; বিভিন্ন বস্তু, গুণ, ক্রিয়া, হেতু, ফল ইত্যাদি স্থূল ও সূক্ষ্ম যে কোনও বিষয়ই ভোক্তা ভোগ করিয়া থাকেন সে সকলই সর্বদা মনই সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিশ্ব যদি সত্যই থাকিত তবে সুষুপ্তিকালেও তাহার উপলব্ধি হইত। কিন্তু সুষুপ্তিকালে জগৎপ্রপঞ্চের কিছুরই অনুভব হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সে সকল স্বপ্নবৎ মিথ্যা। [তাৎপর্য—সুষুপ্তি অর্থ মনের অভাব। জগৎ যদি মন হইতে পৃথক্ হইত, তবে মনের অভাবে জগতের অভাব হইবে কেন? অর্থাৎ জগৎ মনোময়।]

৬। আমরা যে মনোজগৎ দেখি তাহার কারণ হিসাবেও কোন বাহ্যজগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না; এ বিষয়ে ঃ—

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ।
নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাৎ॥ ২৫
—গৌড়পাদ ঃ মাণ্ডূক্য-কারিকা ঃ অলাতশান্তিপ্রকরণ

অর্থাৎ, যদি যুক্তিপরায়ণ হইয়া আন্তর ব্যাপারের বা অনুভূতির বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন আছে বলা হয়, তবে তাহাও ঠিক নহে। কারণ, ভাল ভাবে বিচার করিলে উক্ত তথাকথিত বাহ্য কারণকে কোনও প্রকৃত কারণ বলিয়াই স্বীকার করা যায় না। [তাৎপর্য—সেই তথাকথিত বাহ্য কারণের অস্তিত্বেরই বা প্রমাণ কি? শুধু ঐ আন্তর অনুভবই তো! আন্তর অনুভবের কারণ হিসাবে যে বাহ্য বিষয়কে দাঁড় করান হইল তাহারও কারণ খুঁজিতে গিয়া সেই আন্তর অনুভবেই ফিরিয়া আসিতে হয়। অর্থাৎ আন্তর অনুভূতি-বৈচিত্র্যের কোন বাহ্য কারণ নাই। অন্তরস্থ অবিদ্যাই উহার কারণ। আরও কথা এই যে শুদ্ধচিত্তে পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞান হইলে বাহ্য বিষয়কে বিষয়রূপে দর্শনই হয় না; তখন উহা জ্ঞানখণ্ডরূপেই অনুভূত হয়; অর্থাৎ উহা জ্ঞানেই পর্যবসিত হয়। অথবা ভ্রান্তিবশে রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প যেমন ভ্রমনাশে তিরোহিত হয়, আন্তর বা বাহ্য বিষয়সকলও তদ্রূপ সুষুপ্ত, সমাহিত বা জ্ঞানাবস্থায় দৃষ্টই হয় না—যেহেতু তখন ভ্রান্ত-দর্শন থাকে না। সুতরাং আত্মাতিরিক্ত কোনও বিষয়ের অস্তিত্বই সিদ্ধ নয়। জ্ঞানোদয়ে বাহ্য বা আন্তর সকল অনুভবই শুদ্ধ চৈতন্যরূপেই প্রতিভাত হয়—অর্থাৎ, আন্তর অনুভবের বৈচিত্র্যও থাকে না।]

৭। দৃশ্যবর্গ আত্মাতিরিক্ত নয়—আবার শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মাও দৃশ্য নন—ইহা কিরূপে হইতে পারে, তাহার সমাধানে বলা হইয়াছে যে আত্মশক্তি মায়ার দ্বারা স্পন্দিত হইলে এক এবং অদৃশ্য আত্মাই দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টা রূপে প্রতিভাত হন ঃ—

(ক) কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মাদেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্ত-নিশ্চয়ঃ॥ ১২
জীবং কল্পয়তে পূর্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথা বিদ্যস্তথা স্মৃতিঃ॥ ১৬
—গৌড়পাদ ঃ মাণ্ডূক্য-কারিকা ঃ বৈতথ্য-প্রকরণ

অর্থাৎ, স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় মায়াশক্তিপ্রভাবে আপনিই আপনাকে বিভিন্ন পদার্থাকারে কল্পিত করেন; এবং তিনিই আবার সে সকল পদার্থ অনুভব করেন। প্রথমে "আমি কর্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদি ভাবাপন্ন [ও সমস্ত কল্পনাক্ষম] জীবের কল্পনা হয় এবং উক্ত জীব যাদৃশ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাদৃশই স্মৃতি লাভ করে।

(খ) ঋজু-বক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং যথা।
গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানস্পন্দিতং তথা॥ ৪৭
—গৌড়পাদ ঃ মাণ্ডূক্য-কারিকা ঃ অলাতশান্তিপ্রকরণ

অর্থাৎ, অলাতের (জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের) পরিভ্রমণে (একটি মাত্র অগ্নিবিন্দুই) যেরূপ সরল ও বক্রাদি নানা রূপ রেখারূপে প্রকাশমান্ হয়, (অবিদ্যাকৃত) বিজ্ঞানস্পন্দনও তদ্রূপ গ্রহণাকারে (বিষয়রূপে) ও গ্রাহকাকারে (বিষয়ী বা দ্রষ্টারূপে) প্রকাশিত হইয়া থাকে।

[আচার্য গৌড়পাদের যুগে সিনেমার প্রচলন হয় নাই। তখন যদি সিনেমার প্রচলন থাকিত, তবে হয়তো তিনি শ্লোকটি এইভাবে রচনা করিতেন ঃ—

সিনেমাস্থিতসংসার আলোকস্পন্দিতং যথা।
জাগ্রৎকালীনসংসারো বিজ্ঞানস্পন্দিতং তথা॥

অর্থাৎ, সিনেমাতে যে জগৎ-সংসার দেখা যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে নাই; উহা আলোকের কম্পনমাত্র। জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জগৎ-সংসারও তদ্রূপ চিৎস্পন্দন মাত্র।]

(গ) যথা স্তিমিতগম্ভীরজলরাশৌ মহার্ণবে।
সমীরণবশাদ্ বীচি র্ন বস্তু সলিলেতরৎ॥ ১০
তথা হি পূর্ণ চৈতন্যে মায়য়া দৃশ্যতে জগৎ।
ন তরঙ্গো জলাদ্ ভিন্নো ব্রহ্মণোঽন্যজ্জগন্ ন হি॥ ১১
শান্তি-গীতা ঃ সপ্তম অধ্যায়

অর্থাৎ, স্তিমিত গম্ভীর জলরাশিপূর্ণ মহাসমুদ্রে সমীরণবশে উত্থিত তরঙ্গাদি যেরূপ জল ভিন্ন অন্য বস্তু নহে, সেই প্রকার অধিষ্ঠান পূর্ণব্রহ্মচৈতন্যে বা আত্মায় মায়া প্রভাবে নামরূপাত্মক এই যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে তাহা ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন অন্য কোনও পৃথক্ বস্তু নহে।

(ঘ) যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া
তথা জাগ্রদ্ দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া॥ ৬১
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ ন সংশয়ঃ॥ ৬২
অভূতাভিনিবেশাদ্ হি সদৃশে তৎ প্রপদ্যতে।
বস্তুভাবং স বুদ্ধৈব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ততে॥ ৭৯
নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ।
বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎ সাম্যমজমদ্বয়ম্॥ ৮০
অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ম্॥
সকৃদ্ বিভাতো হ্যেবৈষ ধর্মো ধাতুঃ স্বভাবতঃ॥ ৮১
—গৌড়পাদ ঃ মাণ্ডূক্য-কারিকা ঃ অলাতশান্তিপ্রকরণ

অর্থাৎ, স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট যে দ্বৈত তাহা প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও চিত্ত স্বয়ং মায়া দ্বারা স্পন্দিত হইয়া ঐরূপ দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান্ হয়। সেইরূপ, জাগ্রৎকালেও চিত্তই মায়াবশতঃ স্পন্দিত হইয়া দ্বৈতাকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক অদ্বয় চিত্তই যে স্বপ্নকালে দ্বৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও এক অদ্বয় চিত্তই দ্বৈতাকারে

প্রকাশমান্ হয়। (দ্বৈত বাস্তবিক অসত্য হইলেও তাহা সত্য এই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়াই) চিত্তের অসত্য বস্তুতে অনুরাগ জন্মে এবং সেই জন্যই চিত্ত তদনুরূপে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ অনুরঞ্জিত হয়। কিন্তু দৃশ্যের বাস্তবতা নাই ইহা যখন বুঝিতে পারে তখন সেই চিত্তই অসঙ্গ, অর্থাৎ, অনাসক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে। অসত্যবোধে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্ত পরেও (ঐ কারণেই) অন্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে। যাঁহারা বুদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ পরম সত্য পদার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শুধু অজ, নির্বিশেষ, অদ্বয় ব্রহ্মই প্রতীতির বিষয় হন। এ অবস্থায় জন্ম, নিদ্রা ও স্বপ্নবিহীন আত্মা আপনা হইতেই প্রকাশিত হন—কারণ সত্যস্বরূপ আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কোনও দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন নাই।

৮। অদ্বয় আত্মা বা ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য বস্তু এবং জীবও যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই; এ বিষয়ে ঃ—

(ক) ব্রহ্ম সত্যং জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব হি সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্ত-ভিত্তিমঃ॥ ২১
— শঙ্কর ঃ ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা।

অর্থাৎ, ব্রহ্মই সত্য; জগৎ মিথ্যা এবং জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়। ইহাই উৎকৃষ্ট শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত—ইহাই সমস্ত বেদান্তের সারভূত উচ্চনিনাদ।

(খ) ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতৎ তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ ন জায়তে॥ ৪৮
—গৌড়পাদ ঃ মাণ্ডূক্য-কারিকা ঃ অদ্বৈতপ্রকরণ

ধর্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ।
জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে॥ ৫৮
—গৌড়পাদ ঃ মাণ্ডূক্য-কারিকা ঃ অলাতশান্তিপ্রকরণ

অর্থাৎ, কোনও জীবই প্রকৃতপক্ষে জন্মে না; ইহার উৎপাদকও কেহ নাই। ইহাই সেই চরম সত্য বা পরমার্থ বস্তু ব্রহ্ম, যে ব্রহ্মে কোনও কিছুই জন্মায় না। ধর্মপদবাচ্য যে সকল আত্মা বা অন্য বিষয় জন্মে বলিয়া কথিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা জন্মায় না। সে সকলের জন্ম মায়া-সদৃশ; আবার সেই মায়াও প্রকৃতপক্ষে নাই।

(গ) স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং সস্মাদন্যন্ ন কিঞ্চন॥ ৩৮৮
সর্বাধারং সর্ববস্তুপ্রকাশং
সর্বাকারং সর্বগং সর্বশূন্যম্।
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং
ব্রহ্মাদ্বৈতং যৎ তদেবাহমস্মি॥ ৫১৩

—শঙ্কর: বিবেকচূড়ামণি

অর্থাৎ, নিজ আত্মাই ব্রহ্মা, আত্মাই বিষ্ণু, আত্মাই ইন্দ্র, আত্মাই শিব। আত্মাই সর্ববিশ্বরূপে প্রকাশমান্। আত্মা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই। বিশ্বজগতের অধিষ্ঠান, সর্ববস্তুপ্রকাশক, উপাধিভেদে সর্ববস্তুরূপে এবং সর্ব বস্তুতে বিরাজমান্, অথচ সর্বদ্বৈতশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ, নিশ্চল, নির্বিকল্প যে ব্রহ্ম আছেন, আমি সেই ব্রহ্মই।

(ঘ) অদৃশ্যং ভাবরূপঞ্চ সর্বমেব চিদাত্মকম্।
সাবধানতয়া নিত্যং স্বাত্মানং ভাবয়েদ্ বুধঃ॥ ১৪১

—শঙ্কর: অপরোক্ষানুভূতি

অদৃশ্যরূপেই হউক বা বিষয়রূপে প্রকাশমানই হউক—সবই একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ নিজ আত্মাই—জ্ঞানী সর্বদা সাবধানে এই সত্য মনে রাখিবেন।

(ঙ) মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা॥ ২।১০

—অষ্টাবক্রসংহিতা

অর্থাৎ, মৃত্তিকায় কলস, জলে ঢেউ বা স্বর্ণে বলয়ের ন্যায় এই বিশ্ব আমা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

(চ) যৎ ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে।
কিং পৃথগ্ ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্॥ ১৫।১৪
—অষ্টাবক্রসংহিতা

অর্থাৎ, যাহাই কিছু তুমি দর্শন কর, তাহাতে একমাত্র তুমি নিজেই শুধু প্রকাশ পাইতেছ। কটক, অঙ্গদ, নূপুর প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার কি স্বর্ণ হইতে কোনও পৃথক্ বস্তু?

৯। শুদ্ধ চৈতন্য বা পরমাত্মা ভিন্ন আর কোনও কিছু কোথাও নাই—সবই শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র; এ বিষয়ে আরও কয়েকটি বাক্য:—

তরঙ্গফেনভ্রমবুদ্‌বুদাদি
সর্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা।
চিদেব দেহাদ্যহমেন্তমেতৎ
সর্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্॥ ৩৯০
পাষাণবৃক্ষতৃণধান্যকড়ঙ্করাদ্যা
দগ্ধা ভবন্তি হি মৃদেব যথা তথৈব।
দেহেন্দ্রিয়াসুমনআদি সমস্তদৃশ্যং
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপযাতি পরাত্মভাবম্॥ ৫৬৩
—শঙ্কর: বিবেকচূড়ামণি

অর্থাৎ, তরঙ্গ, ফেনা, অবর্ত, বুদ্‌বুদ্ প্রভৃতি সব কিছু যেমন স্বরূপতঃ জল মাত্র, সেইরূপ স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্যন্ত এবং [দেহের বহিঃস্থ স্থূল, সূক্ষ্ম যাবতীয়] অন্যান্য সমস্ত বিষয়ই একরস বিশুদ্ধ চৈতন্যই। পাষাণ, বৃক্ষ, তৃণ, ধান্য, তুঁষ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু অগ্নিদগ্ধ হইলে যেরূপ এক মৃত্তিকাতেই পর্যবসিত হয়; সেইরূপ, অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি সমস্ত দৃশ্যবর্গই চিৎস্বরূপ পরমাত্মারূপে প্রতিভাত হয়।

মহা মহা মনীষীবর্গ এইরূপ অসংখ্য বাক্যে আমাদের বিচার ও সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। আশা করি যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে প্রথম অধ্যায়ে নিজ সরল বিচারবুদ্ধি দ্বারা আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, সেই বিচার ধারা এবং সেই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী মনীষীগণ কর্তৃক সমর্থিত। সুতরাং আমাদের বিচার ধারা ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আর কোনও রূপ সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের, এমনকি বেদান্তাচার্যদিগের চিত্তও সম্পূর্ণ নির্মল না হইতে পারে, সুতরাং তাঁহাদিগের বিচার এবং সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ অভ্রান্ত না হইতে পারে—এরূপ আশঙ্কা যদি কেহ করেন, তবে তদুত্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে আচার্য শঙ্কর প্রভৃতিকে সাধারণ পণ্ডিত বা আচার্যগণের মধ্যে গণ্য করা যায় না। তাঁহারা ঋষি বা অবতারতুল্য পুরুষ; তাঁহাদের বুদ্ধির নির্মলতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সে যাহা হউক, নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব ঈশ্বরে যে ঐ প্রকার দোষ কখনও স্পর্শ করে না—একথা সকলেই স্বীকার করেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরের বাক্যরূপ শ্রুতিবাক্যকেই আমাদের সকল সম্প্রদায়ের আচার্যগণ চরম প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, যে সিদ্ধান্ত শ্রুতি-সম্মত তাহাই চরম সিদ্ধান্ত। সুতরাং পাঠকের মনে এ কৌতূহলের উদয় হইতে পারে যে আমাদের সিদ্ধান্ত শ্রুতিসম্মত কি না। এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এখানে বিভিন্ন উপনিষৎ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করা হইল—যদিও, যাঁহারা আচার্য শঙ্করের রচনা কথঞ্চিৎও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে আচার্য শঙ্কর সর্বত্রই তাঁহার বক্তব্যকে শ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়াই বলিয়াছেন। আমাদের যাহা প্রতিপাদ্য সেই নির্গুণ ব্রহ্মবাদই যে সমগ্র বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই—যদিও, অনধিকারী ব্যক্তিকে ক্রমশঃ অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য অনেক ক্রিয়াত্মক ও উপাসনাত্মক, অর্থাৎ দ্বৈতাত্মক উক্তিও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও সূক্ষ্ম বা উচ্চ তত্ত্বের

ব্যাখ্যা বা উপদেশ করিতে গেলে অনেক স্থূল বা নিম্নতর বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গতঃ আসিয়াই যায়, কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলি মুখ্য বক্তব্য হইতে পারে না। অদ্বৈত-তত্ত্ব, বেদের যাহা শীর্ষস্থানীয়—সেই উপনিষদংশের অসংখ্য স্থলেই স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে সন্নিহিত আছে। তাহার সকলের উল্লেখ ও বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়—তাহার প্রয়োজনও নাই। কারণ, শুধু বা প্রধানতঃ শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ, সরল, যুক্তি-বিচারও যে আমাদিগকে অদ্বৈত-তত্ত্বেই লইয়া যায়, এইটুকু প্রতিপাদন করাই বর্তমান প্রবন্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য। তাহার সমর্থনে শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ প্রসঙ্গতঃ মাত্র।

॥ এক ॥

তৎপূর্বে প্রথমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, কারণ ইহা স্মৃতি-গ্রন্থ হইলেও অনেকের মতে ইহাতে উপনিষদের সার নিহিত আছে। অধিকন্তু, এই গ্রন্থ জনসাধারণের এবং সাধকবর্গের নিকট অধিকতর সুপরিচিত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বলিয়া ইহার প্রামাণ্যও সর্বজনস্বীকৃত। গীতা কিন্তু প্রধানতঃ সাধনবিষয়ক গ্রন্থ; অর্থাৎ নিছক তত্ত্ব পরিবেশনের স্থান ইহা নয়। তথাপি অদ্বৈততত্ত্বই যে গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই; কারণ, যাহা অদ্বৈত-তত্ত্বের উপলব্ধির সাধন (এবং যাহা তাহাতে সিদ্ধিলাভের স্বাভাবিক ফলও বটে), সেই সর্বত্র সমতাবুদ্ধি—শুভ, অশুভ; শত্রু, মিত্র; লাভ, ক্ষতি; নিন্দা, স্তুতি; ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল—সর্বত্র সমজ্ঞানের উপদেশ—গীতার প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু, নিছক অদ্বৈততত্ত্বের উল্লেখও বহু স্থানেই রহিয়াছে। তাহার অল্প কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লিখিত হইল।

(ক) ব্রহ্মই সব ; ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নাই ; এ বিষয়ে ঃ—

(i) ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসামাধিনা॥ ৪।২৪

অর্থাৎ, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি (যদি লোকশিক্ষার জন্য যজ্ঞাদি কর্ম করেনও তবে তিনি) যাহা দ্বারা অগ্নিতে ঘৃত অর্পণ করা হয় তাহাকে, ঘৃতকে, অগ্নিকে এবং হোমকর্তাকে (নিজকে) ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। এইরূপে কর্ম করিয়াও যিনি কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, করণ ইত্যাদি সকলকেই অভেদজ্ঞানে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া তাহাতে সমাহিত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান।

(ii) যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা॥ ১৩।৩০

অর্থাৎ, যখন সাধক ভূতগণের আপাত প্রতীয়মান পৃথক্ ভাবকে এক আত্মাতেই অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন এবং আত্মা হইতেই সকল ভূতের বিকাশ উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান।

(iii) সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
১৮।২০

অর্থাৎ, যে জ্ঞান দ্বারা অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্যন্ত নানা রূপে প্রতীয়মান্ সকল বস্তুতে এক অবিভক্ত আত্মবস্তুরই দর্শন হয়, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) জ্ঞান বলিয়া জানিবে।

(খ) অবতার পুরুষগণ নিজকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া নিজেই সব কিছু হইয়াছেন এইরূপ অনুভব করেন; অর্থাৎ, সব কিছুর মধ্যেই নিজকেই দর্শন করেন ; এ বিষয়ে ঃ—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৯।৪

অর্থাৎ, অব্যক্তমূর্তি (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) আমার দ্বারা এই বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সকল ভূত আমাতে অবস্থিত—কিন্তু আমি সে সকলকে আশ্রয় করিয়া নাই। (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

(গ) শুধু অবতার পুরুষগণই যে ঐরূপ অনুভব করেন তাহা নয়, অপর জ্ঞানযোগীদের অনুভবও ঐ প্রকার; এ বিষয়ে ঃ—

(i) সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শন ঃ॥ ৬।২৯

অর্থাৎ, সমাধিবান্ পুরুষ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া সর্বভূতে নিজের আত্মাকে এবং নিজ আত্মাতেই সর্বভূতকে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন।

(ii) সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৬।৩১

অর্থাৎ সর্বভূতে অবস্থিত বাসুদেব আমাকে স্বীয় আত্মারূপে অভেদ জ্ঞানে যিনি ভজনা করেন, অর্থাৎ আমি বাসুদেবই—এইরূপ অপরোক্ষানুভব করেন, সেই যোগী প্রারব্ধবশে যে কোনও অবস্থায় বিদ্যমান্ থাকিয়াও প্রকৃতপক্ষে আত্মাতেই অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করেন।

॥ দুই ॥

এক্ষণে আমরা কয়েকটি প্রধান প্রধান উপনিষৎ হইতে কিছু বাক্য উদ্ধৃত করিব।

১। শুক্ল-যজুর্বেদান্তর্গত ঈশোপনিষৎ হইতে ঃ—

(ক) যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬

অর্থাৎ, যিনি (যে জ্ঞানী ব্যক্তি) সকল বস্তুকেই নিজের আত্মাতে

এবং সকল বস্তুতেই নিজের আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি, সেই দর্শনের ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

(খ) যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭

অর্থাৎ, যে কালে, অর্থাৎ জ্ঞান লাভের পর যখন সমুদয় বস্তু জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া গেল, সে অবস্থায় সেই একমাত্র তত্ত্বদর্শনকারীর নিকট মোহই বা কি আর শোকই বা কি?

২। সামবেদান্তর্গত কেনোপনিষৎ হইতে ঃ—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥ ১।৩

অর্থাৎ, সেখানে নয়ন গমন করে না, বাক্য গমন করে না, মনও যাইতে পারে না; সুতরাং উক্ত ব্রহ্ম কিরূপ তাহা জানি না বা কিরূপে উহা অপরকে বুঝাইতে হয় তাহাও জানি না।

৩। কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত কঠোপনিষৎ হইতে ঃ—

(ক) তং দুর্দশং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১।২।১২

অর্থাৎ, দুর্জ্ঞেয়রূপে অবস্থিত, হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত ও অনর্থসঙ্কুল দেহে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া যে আত্মাকে অতি কষ্টে অনুভব করা যায়, ধীর ব্যক্তি সেই সনাতন ও স্বপ্রকাশ আত্মাকে নিদিধ্যাসনসহায়ে সাক্ষাৎ করিয়া সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হন।

(খ) ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ১।২।১৮

অর্থাৎ, আত্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে ব্রহ্ম বা আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। এই আত্মা অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন হন নাই; ইহা হইতেও অন্য কিছু উৎপন্ন হয় নাই। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নিহত হইলেও আত্মার নাশ হয় না।

(গ) যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে॥
এতদ্ বৈ তৎ॥ ২।১।৩

অর্থাৎ, এই যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারা জীব রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও পরস্পরসংযোগোদ্ভূত সুখ অবগত হয়, সেই আত্মার নিকট কোন্ বস্তু অজ্ঞাত থাকিতে পারে? ইনিই (নচিকেতার জিজ্ঞাসিত) সেই আত্মা। (অর্থাৎ, আত্মাই সর্বজ্ঞ)।

(ঘ) মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ২।১।১১

অর্থাৎ, (বিশুদ্ধ) মন দ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞান লাভ করিতে হয়। এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। যে এই ব্রহ্মে নানা-ভাবের ন্যায় দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পর মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ জন্মমৃত্যু প্রবাহের অধীন থাকিয়া যায়।

(ঙ) পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥
এদদ্বৈ তৎ॥ ২।২।১

অর্থাৎ, জন্মরহিত নিত্যচৈতন্যস্বরূপের (আত্মার) একাদশ দ্বারযুক্ত একটি নগর (দেহ) আছে। সেই পুরস্বামীর (সম্যগ্ বিজ্ঞানপূর্বক) ধ্যান করিয়া (সাধক) ইহজন্মেই মুক্ত হইয়া যান এবং দেহপাতের পর কৈবল্য প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আর জন্ম গ্রহণ করেন না। ইনিই সেই আত্মা।

(চ) অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ২।২।৯

অর্থাৎ, যেরূপ একই অগ্নি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন দাহ্য বস্তুর আকার অনুযায়ী তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরস্থ আত্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জীব দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সদৃশ হইয়াছেন। তথাপি তিনি তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তদতিরিক্ত নির্বিকাররূপেই রহিয়াছেন।

(ছ) যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতা।
অথ মর্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ২।৩।১৪

অর্থাৎ, সাধকের হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে, সে সকল যখন দূরীভূত হয়, তখন মরণশীল এই মানবই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান।

৪। অথর্ববেদান্তর্গত প্রশ্নোপনিষৎ হইতে ঃ—

এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥ ৪।৯

অর্থাৎ, এই সর্বাধার আত্মাই (উপাধিযোগে জীবদেহে) দ্রষ্টা, স্পর্শকর্তা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্তা, আস্বাদকর্তা, মননকারী, নিশ্চয়কারী, কর্তা ও বিজ্ঞাতৃস্বরূপ পুরুষ। সেই পুরুষই (উপাধিবিলয়ে) অক্ষর পরমাত্মায় সম্প্রতিষ্ঠিত হন।

৫। অথর্ববেদান্তর্গত মুণ্ডকোপনিষৎ হইতে ঃ—

(ক) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ২।২।৯

অর্থাৎ, কার্য ও কারণরূপী সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে উক্ত

সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

(খ) ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ ২।২।১২

অর্থাৎ, অমৃতস্বরূপ এই ব্রহ্মই পুরোভাগে, ব্রহ্মই পশ্চাদ্‌ভাগে, ব্রহ্মই দক্ষিণে ও উত্তরে, অধঃ ও ঊর্ধ্বদিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। [অধিক কি, নামরূপবিশিষ্টরূপে অবভাসমান] এই বিশ্বজগৎ এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই।

৬। **অথর্ববেদান্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষৎ হইতে ঃ—**

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম ; অয়মাত্মা ব্রহ্ম··· ॥ ২

অর্থাৎ, এই সমস্তই ব্রহ্ম ; এই আত্মা ব্রহ্ম (সুতরাং প্রত্যগাত্মাই বিশ্বজগৎ রূপে অবভাসমান্)।

৭। **কৃষ্ণ যজুর্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয়োপনিষৎ হইতে ঃ—**

(ক) ···সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম··· ॥ ২।১।৩

অর্থাৎ, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।

(খ) ···রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী
ভবতি··· ॥ ২।৭

অর্থাৎ, তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ (আনন্দস্বরূপ)। এই জীব সেই রসকে লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়।

(গ) ···যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽ নিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি। যথা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।··· ২।৭

অর্থাৎ, যখনই সাধক এই দর্শনাতীত, অশরীর, অনির্বাচ্য, নিরাধার বস্তুতে নির্ভিকরূপে স্থিতি লাভ করে তখনই সে অভয়

প্রাপ্ত হয়। যখনই অবিদ্বান্ সাধক এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করেন তখনই তাহার ভয় হয়।

(ঘ) যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ইতি।
এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্।
কিমহং পাপমকরবমিতি।
স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে।
উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে।
য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ২।৯

অর্থাৎ, যে ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া বাক্যসমূহ ও মন প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দকে যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কোনও কিছু হইতেই ভীত হন না। কেন আমি উত্তম কর্ম করি নাই, কেন আমি অসৎ কর্ম করিয়াছিলাম—এই প্রকার পশ্চাত্তাপ শুধু সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকেই সন্তপ্ত করে না—যিনি এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন; কারণ যিনি এইরূপ জ্ঞানবান, তিনি ঐ উভয়কেই, অর্থাৎ উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান ও পাপ কর্মের অনুষ্ঠানকে আনন্দস্বরূপ নিজ আত্মা বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। ইহাই পরম রহস্য ব্রহ্মবিদ্যা॥

(ঙ) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি··· ॥ ৩।১

অর্থাৎ, যাঁহা হইতে এই নিখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশকালে যাঁহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর; তিনিই ব্রহ্ম।

(চ) আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। ... ৩।৬

অর্থাৎ, আনন্দই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ, এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশকালে আনন্দেই বিলীন হয়।

৮। ঋগ্‌বেদান্তর্গত ঐতরেয়োপনিষৎ হইতে ঃ

এষ ব্রহ্ম, এষ ইন্দ্রঃ, এষ প্রজাপতিঃ, এতে সর্বে দেবাঃ, ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি—পৃথিবীবায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি, ইতরাণি চেতরাণি চ অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ, অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্; সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম॥ ৩।১।৩

অর্থাৎ, এই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই হিরণ্যগর্ভ; ইনিই দেবরাজ ইন্দ্র; ইনিই বিরাট; ইনিই এই সকল দেবতা; ইনিই সকল পঞ্চমহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ; এবং অপর জীবগণের উৎপাদক ক্ষুদ্র প্রাণীসকল; অধিকন্তু সকল সচল ও অচল সমস্তই, অর্থাৎ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ জীব—অশ্ব, গো, মনুষ্য ও হস্তিসমূহ এবং যে সকল প্রাণী পায়ে চলে বা আকাশে উড়ে, অথবা যাহারা অচল—এ সমস্তই ইনি। প্রজ্ঞানই তৎসমূহকে সত্তা দান করেন ও নিয়মিত করেন; প্রজ্ঞানেই তাহারা প্রতিষ্ঠিত; সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; প্রজ্ঞানই সমস্ত জগতের আশ্রয়। সুতরাং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

৯। কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ হইতেঃ

(ক) বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ৩।৮

অর্থাৎ, স্বপ্রকাশ ও অজ্ঞানাতীত এই সর্বব্যাপী পুরুষকে আমি জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলেই (লোক) মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে। পরমার্থ লাভের অপর কোনও উপায় নাই।

(খ) মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ ৪।১০

অর্থাৎ, (যাহাকে জগতের উৎপাদক বলা হয় সেই) প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। সেই পরমেশ্বরের অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসকল দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

(গ) একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ ৬।১১

অর্থাৎ, অদ্বিতীয়, জ্যোতিঃস্বরূপ (অর্থাৎ স্বপ্রকাশ) পরমাত্মা সর্বপ্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি সর্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের অধিষ্ঠান, সর্বসাক্ষী, চেতয়িতা (চৈতন্যাভিব্যক্তির কারণ), নিরুপাধিক ও নির্গুণ।

১০। সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতেঃ—

(ক) সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম··· ॥ ৩।১৪।১

অর্থাৎ, এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই।

(খ) যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ ৬।১।৪

অর্থাৎ, হে সৌম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকার পরিণামভূত সমস্তই জানা যাইতে পারে—কারণ, সমস্ত বিকারই বাগাবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল মৃত্তিকাই সত্য।

(সেইরূপ, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। নামরূপ মিথ্যা। নামরূপাত্মক জগৎরূপে তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। সুতরাং চিৎ-স্বরূপ নিজ আত্মাকে জানিলেই সব কিছু জানা হইল—ইহাই ভাবার্থ।)

(গ) সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্···॥ ৬।২।১

অর্থাৎ, হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্‌রূপে বিদ্যমান্ ছিল।

(ঘ) স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো···॥ ৬।৮।৭

অর্থাৎ, সেই যে (সদাখ্য) সূক্ষ্ম (কারণ) তাঁহারই দ্বারা এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্; তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো, তুমিই সেই সৎ (বা ব্রহ্ম)।

(ঙ)···তরতি শোকমাত্মবিদ্···। ৭।১।৩

অর্থাৎ, আত্মবিদ্ শোক অতিক্রম করেন।

(চ) যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি···॥ ৭।২২।১

অর্থাৎ, যখন কেহ সুখলাভ করেন তখন (চিত্তের একাগ্রতা সাধনাদি) কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হন, সুখলাভ না করিয়া কেহ কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হন না।

(ছ) যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি··· ॥ ৭।২৩।১

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং··· ॥ ৭।২৪।১

অর্থাৎ, যাহা ভূমা তাহাই সুখ ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হইবে। যাহাতে কেহ অপর কিছু দেখে না, অপর কিছু শুনে না, অপর কিছু জানে না, তিনিই ভূমা ; আর যাহাতে অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শুনে, অন্য কিছু জানে—তাহাই অল্প। যিনি ভূমা তিনিই অমৃত ; আর যাহা অল্প তাহাই মর···(অবিদ্যাবস্থায়ই দ্বৈতের দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞান হয়। ভূমাতে অর্থাৎ আত্মাতে বা ব্রহ্মে এই দ্বৈত নাই—সুতরাং জ্ঞানাবস্থার তাদৃশ দর্শনাদিও নাই)।

(জ) স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তা-দহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি ॥ ৭।২৫।১

আথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি··· ॥ ৭।২৫।২

অর্থাৎ, তিনিই (ভূমাই বা ব্রহ্মই) অধোভাগে, তিনি ঊর্ধ্বে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনিই এই সমস্ত (অর্থাৎ, তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নাই)। অতঃপর (ভূমা বা ব্রহ্ম যে দ্রষ্টা জীব হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন নহেন, তাহা বুঝাইবার জন্য) অহম্ (আমি) অবলম্বনে উপদেশ : আমিই অধোভাগে, আমি

ঊর্দ্ধে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে, আমিই এই সমস্ত। (সুতরাং আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং আমা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু নাই।)

(আবার পাছে যদি কেহ দেহেন্দ্রিয়াদির সমষ্টিকেই আমি মনে করিয়া বসেন এই আশঙ্কায়, আমি বলিতে যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকেই বুঝিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য) এখন আত্মাবলম্বনে উপদেশ :—আত্মাই অধোভাগে, আত্মা ঊর্দ্ধে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে। আত্মাই এই সমস্ত।

(ঝ) আকাশ বৈ নাম নামরূপয়োর্নিবহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা··· ॥ ৮।১৪।১

অর্থাৎ, যিনি আকাশ এই নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপকে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত করেন। উক্ত নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা।

১১। শুক্ল যজুর্বেদান্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে—

(ক)···দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি ॥ ১।৪।২

অর্থাৎ, দ্বিতীয় (নিজ হইতে ভিন্ন অন্য) বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে।

(খ) তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা··· ॥ ১।৪।৮

···ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।···ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি ··· ॥ ২।৪।৫

অর্থাৎ, এই আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়তর ; বিত্ত হইতে প্রিয়তর ; অপর সকল বস্তু হইতে প্রিয়তর ; কারণ এই যে আত্মা, ইনি অন্তরতম। (মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য) হে প্রিয়ে! পতির জন্যই যে পতি (জায়ার) প্রিয় হন তাহা নহে ; পত্নীর আপনার প্রয়োজনেই পতি পত্নীর প্রিয় হন। হে প্রিয়ে! পত্নীর জন্যই যে পত্নী (পতির) প্রিয়া হন তাহা নহে ; (পতির) আত্মপ্রয়োজনেই পত্নী (পতির) প্রিয়া হন। হে প্রিয়ে! পুত্রগণের জন্যই যে পুত্রগণ (পিতামাতার) প্রিয় হয় তাহা নহে ; (পিতামাতার) আত্মপ্রয়োজনেই পুত্রগণ (পিতামাতার) প্রিয় হয়।…(এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত)…। হে প্রিয়ে! সর্ব বস্তুর জন্যই যে সর্ব বস্তু প্রিয় হয় তাহা নহে ; আত্মার জন্যই সর্ব বস্তু প্রিয় হয়।

(গ) ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ… ॥ ১।৪।১০

অর্থাৎ, ইনি (অর্থাৎ, দেহস্থ জীব) (জ্ঞানোদয়ের পূর্বেও) ব্রহ্মই ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞানবশে তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। পরে, (জ্ঞানোদয়ে) তিনি আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" এবম্প্রকারে জানিলেন। ইহার ফলে তিনি সর্বাত্মক হইলেন।

(ঘ) …অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ম্… ॥ ২।৩।৬

অর্থাৎ, অতএব অতঃপর "নেতি" "নেতি" (ইহা নয়, ইহা নয়) ইহাই ব্রহ্মের (বা আত্মার) নির্দেশ ; কারণ, "নেতি" এই বাক্য হইতে অপর কোনও শ্রেষ্ঠ নির্দেশ (ব্রহ্মের বা আত্মার) নাই।

(ঙ)…আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ… ॥ ২।৪।৫

অর্থাৎ, (হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ী), আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিধিধ্যাসিতব্য (নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়)।

(চ) ···ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা····· ॥ ২।৪।৬

অর্থাৎ, এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেববৃন্দ, এই ভূতবর্গ এবং (নিখিল বিশ্বে যাহা কিছু আছে সে) সকলই এই আত্মা··· ।

(ছ) ···রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥ ইতি।

অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্ ॥
··· ২।৫।১৯

অর্থাৎ, পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছেন। ইহা তাহার স্বরূপ প্রকাশের জন্য (কারণ, জগতে যদি নাম ও রূপ প্রকাশিত না হইত, যদি গুরু ও শাস্ত্রাদি না থাকিত, তবে সেই শুদ্ধ আত্মার বিজ্ঞানঘন রূপটি জগতে পরিজ্ঞাত হইত না)। পরমেশ্বর মায়া দ্বারা বহু রূপে প্রতীত হন ; কারণ ইহার (অর্থাৎ জীবাত্মার) দেহে দশটি এমনকি শত শত ইন্দ্রিয়সকল সংযোজিত আছে। (প্রকৃতপক্ষে কিন্তু) এই আত্মাই ইন্দ্রিয়বর্গ ; ইনিই দশ ও বহু সহস্র, বহু ও অনন্ত। উক্ত এই ব্রহ্ম অপূর্ব (পূর্ববর্তী কারণবিহীন), অনপর (ইহা হইতে অপর কোনও কার্য উৎপন্ন হয় না), অনন্তর (ইহার মধ্যে অপর কোনও পদার্থ নাই), অবাহ্য (ইহার বাহিরেও কিছু নাই)। এই সর্বানুভবকারী আত্মাই ব্রহ্ম। ইহাই সমস্ত বেদান্তের সারভূত উপদেশ।

(জ) ···ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যে র্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া ন মতে-

র্মন্তারং মন্বীজ্ঞা ন বিথাতে র্বিজ্ঞাতারং বিজ্ঞানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্বান্তরোঽতোঽন্যদার্তম্‌····· ॥ ৩।৪।২

অর্থাৎ, দৃষ্টির দ্রষ্টাকে কেহ দেখিতে পারেন না; শ্রবণের শ্রোতাকে কেহ শুনিতে পারেন না; বুদ্ধিবৃত্তির বোদ্ধাকে কেহ বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারেন না। সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা; তদ্ভিন্ন আর সবই বিনাশশীল।

(ঝ) ··· অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥··· ৩।৮।৮

অর্থাৎ, (এই অক্ষর ব্রহ্ম) অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্ক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর ও অবাহ্য। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না এবং অপর কেহ তাহাকে ভক্ষণ করে না। (অর্থাৎ, তাহাকে কোনও গুণক্রিয়াদিদ্বারা বিশেষিত করিতে পারা যায় না। তিনি সম্পূর্ণ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়।)

(ঞ) তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ···॥ ৩।৮।১১

অর্থাৎ, হে গার্গি! উক্ত অক্ষরকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি নিজে সকলের দ্রষ্টা; তাঁহাকে অপরে শুনিতে পায় না, কিন্তু তিনি নিজে সব কিছু শুনিতে পান; অপরের মননের অবিষয় হইলেও তিনি সকল বিষয় মনন করেন; অন্যের দ্বারা অবিজ্ঞাত হইলেও তিনি নিজে সকল বিষয়ের বিজ্ঞাতা। তাঁহা হইতে ভিন্ন

অপর কোনও দ্রষ্টা নাই; তাঁহা হইতে ভিন্ন অপর কোনও শ্রোতা নাই; তাঁহা হইতে ভিন্ন অপর কোনও মন্তা নাই; তাঁহা হইতে ভিন্ন অপর কোনও বিজ্ঞাতা নাই।

(ট) যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলাপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ॥ ৪।৩।২৩

অর্থাৎ, (সুষুপ্তিকালে) তিনি যে দেখেন না (বলিয়া মনে হয়) তখন তিনি বস্তুতঃ দেখিয়াও দেখেন না; কারণ দ্রষ্টা অবিনাশী বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিরও বিনাশ নাই। কিন্তু তখন তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত দ্বিতীয় বস্তু কিছু থাকে না যাহা তিনি দেখিবেন।

(ঠ)···এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥ ··· ৪।৩।৩২

অর্থাৎ, (সুষুপ্তিকালে যে ব্রহ্মলোক লাভ হয়) ইহা পরম আনন্দের অবস্থা। এই আনন্দেরই অংশমাত্র অবলম্বনে অপর (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ভিন্ন অন্য) জীবগণ জীবন ধারণ করে।

(ড)···অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি॥ ৪।৪।৬

অর্থাৎ, পরন্তু যিনি কামনা পরতন্ত্র নহেন—যিনি, অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম—তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই লীন হইয়া যান।

(ঢ) ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদদ্বয়ং
ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভব-
ন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥ ৪।৪।১৪

অর্থাৎ, এই দেহে থাকিয়াই আমরা কোনও প্রকারে ব্রহ্মকে জানিয়াছি। যদি না জানিতাম তবে জ্ঞানহীন হইতাম ও তৎফলে অনন্ত কালেও জন্ম-মরণ প্রবাহের উচ্ছেদ ঘটিত না। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হন; কিন্তু তদ্ভিন্ন অপরেরা কেবল দুঃখই পাইয়া থাকেন।

(ণ)···অয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ···॥ ৪।৫।১৩

অর্থাৎ, এই আত্মা অন্তর্বহিঃশূন্য ও সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন, অর্থাৎ চিৎস্বরূপ।

(ত) যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ··· ॥ ৪।৫।১৫

অর্থাৎ, যখন (অর্থাৎ, অবিদ্যাদশায় দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টিরূপ উপাধির কল্পনাবশতঃ ব্যষ্টিভাব উৎপন্ন হইলে) ব্রহ্মে দ্বৈতপ্রায় হইয়া থাকে, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন (অর্থাৎ বিদ্যা অবস্থায়) সমস্ত ইহার আত্মাই হইয়া গেল, তখন কি দিয়া কাহাকে দেখিবে, কি দিয়া কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কি দিয়া কাহাকে আস্বাদন করিবে, কি দিয়া কাহাকে বলিবে, কি দিয়া কাহাকে শুনিবে, কি দিয়া কাহাকে চিন্তা করিবে, কি দিয়া কাহাকে স্পর্শ করিবে, কি

দিয়া কাহাকে জানিবে? যাঁহার দ্বারা লোকে এই সমস্তকে জানে, তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে?

১২। **অথর্ববেদান্তর্গত কৈবল্যোপনিষৎ হইতে :—**

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥ ১।১৯

অর্থাৎ, আমা হইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, (স্থিতিকালে) তাহারা আমাতেই অবস্থান করে এবং (লয়কালে) তাহারা আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। আমি সেই অদ্বয় ব্রহ্ম।

১৩। **অথর্ববেদান্তর্গত অমৃতবিন্দু উপনিষৎ হইতে :—**

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ১০

অর্থাৎ, প্রলয় বলিয়া বাস্তবে কিছু নাই; সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই, বদ্ধ জীব বলিয়া কিছু নাই; সাধক, মুমুক্ষু বা মুক্তও কেহ নাই। (অর্থাৎ, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই শুধু আছেন, আর কিছু নাই)। এইটিই চরম সত্য।

(এই শ্লোকটি মাণ্ডূক্যকারিকাতেও আছে : ২।৩২ ; বিবেক-চূড়ামণিতেও আছে : ৫৭৪।)

॥ তিন ॥

উপরে উল্লেখকালে শ্রুতিবাক্যগুলিকে আমাদের বিচার্য বিষয়ানুযায়ী সাজান হয় নাই, কারণ অনেক বাক্যেই একাধিক বিচার্য বিষয় সন্নিহিত আছে এবং অনেক বিচার্য বিষয় একাধিক শ্রুতিবাক্যে নিহিত আছে। অধিকন্তু, অদ্বৈততত্ত্ব যে মাত্র একটি বা দুইটি উপনিষদে সীমাবদ্ধ নাই, উহা যে সকল উপনিষদেরই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা প্রধান প্রধান

তের খানি উপনিষৎ হইতে অন্ততঃ একটি করিয়া শ্রুতিবাক্য সঙ্কলন করিয়াছি। প্রথম দুইটি অধ্যায় পাঠ করা হইয়া থাকিলে, শ্রুতি-বাক্যগুলিতে কোথায় কোন্ বিচার্য বিষয় উল্লিখিত আছে তাহা লক্ষ্য করিতে অসুবিধা হইবার কথা নয়। তথাপি, যদি কোনও পাঠক এক একটি আলোচ্য বিষয় লইয়া তাহা কোন্ শ্রুতিবাক্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জানিতে উৎসুক হন, তবে তাঁহার সুবিধার জন্য পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলির কয়েকটির সংখ্যামাত্র বিষয়ানুযায়ী ভাগ করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

(i) **আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতা ; এ বিষয়ে ঃ—**
বৃহদারণ্যক ঃ ২।৫।১৯ ; ৩।৮।১১

(ii) **আত্মা জন্ম-মৃত্যু-বিকারহীন নিত্য বস্তু ; এ বিষয়ে ঃ—**
কঠ ঃ ১।২।১৮ ; ছান্দোগ্য ৭।২৪।১

(iii) **ব্রহ্মের লক্ষণ ঃ—**
স্বরূপ লক্ষণ ঃ ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ।
তটস্থ লক্ষণ ঃ যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি; যাঁহাতে (স্থিতিকালে) জগতের স্থিতি এবং (প্রলয়ে) যাঁহাতে জগৎ লয় প্রাপ্ত হয় তাহাই ব্রহ্ম।
এ বিষয়ে ঃ—তৈত্তিরীয় ঃ ২।১।৩ ; ২।৭ ; ২।৯ ; ৩।১ ; ৩।৬

(iv) **আত্মা বা ব্রহ্ম বিষয়রূপে জ্ঞেয় নন ; এ বিষয়ে ঃ—**
কেন ঃ ১।৩ ; বৃহদারণ্যক ঃ ২।৩।৬ ; ৩।৪।২ ; ৩।৮।৮ ; ৩।৮।১১ ; ৪।৫।১৫

(v) **অথচ আত্মা নিজে সব কিছু দেখেন, শুনেন, জানেন ; এ বিষয়ে ঃ—**
কঠ ঃ ২।১।৩ ; প্রশ্ন ঃ ৪।৯ ; বৃহদারণ্যক ঃ ২।৫।১৯ ; ৩।৮।১১

(vi) **ব্রহ্ম বা আত্মা সম্পূর্ণরূপে নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয় ; এ বিষয়ে ঃ—**

কেন ঃ ১।৩ ; বৃহদারণ্যক ঃ ২।৩।৬ ; ৩।৮।৮

(vii) **আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ; এ বিষয়ে ঃ—**

বৃহদারণ্যক ঃ ৪।৫।১৩

(viii) **দ্রষ্টার (বা আত্মার) এবং তাঁহার দৃষ্টির সুষুপ্তিতেও— অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই লোপ নাই ; এ বিষয়ে ঃ—**

বৃহদারণ্যক ঃ ৪।৩।২৩

(ix) **আত্মাই মুখ্য প্রিয় বা প্রিয়তম ; এ বিষয়ে ঃ—**

বৃহদারণ্যক ঃ ১।৪।৮ ; ২।৪।৫

(x) **সুষুপ্তিকালে পরম আনন্দ লাভ হয় ; এ বিষয়ে ঃ—**

বৃহদারণ্যক ঃ ৪।৩।৩২

(xi) **একই আত্মা বা ব্রহ্ম নানারূপে জগদাকারে প্রতিভাত হন ; অর্থাৎ, অনাত্ম বা জ্ঞেয় বিষয়সকল বা জগৎও আত্মাতেই অবস্থিত ; অর্থাৎ তাহারাও স্বরূপতঃ আত্মাই ; এ বিষয়ে ঃ—**

ঈশ ঃ ৬, ৭ ; কঠ ঃ ২।২।৯ ; ঐতরেয় ঃ ৩।১।৩ ; মাণ্ডূক্য ঃ ২ ; শ্বেতাশ্বতর ঃ ৪।১০ ; ৬।১১ ; ছান্দোগ্য ঃ ৩।১৪।১ ; ৬।১।৪ ; ৬।৮।৭ ; ৭।২৫।১ ; ৭।২৫।২ ; ৮।১৪।১ ; বৃহদারণ্যক ঃ ১।৪।১০ ; ২।৪।৬ ; ২।৫।১৯ ; কৈবল্য ঃ ১।১৯ ; মুণ্ডক ঃ ২।২।১২

(xii) **নাম ও রূপ মিথ্যা বা জগৎ মিথ্যা ; এ বিষয়ে ঃ—**

পূর্বোক্ত, অর্থাৎ (xi) সংখ্যক উপানুচ্ছেদে উল্লিখিত যাবতীয় শ্রুতিবাক্যই নাম-রূপের—সুতরাং জগতেরও মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে ; কারণ, নাম-রূপ স্বপ্নসম—অর্থাৎ মিথ্যা—না হইলে শুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ আত্মা ও জগৎ কখনও এক হইতে পারে না।

অধিকন্তু, কঠ ঃ ২।১।১১ ; শ্বেতাশ্বতর ঃ ৪।১০ ; ছান্দোগ্য ঃ ৬।১।৪ ; বৃহদারণ্যক ঃ ২।৫।১৯ ; অমৃতবিন্দু ঃ ১০ প্রভৃতি শ্রুতি-

বাক্যে নামরূপের—সুতরাং জগতেরও মিথ্যাত্ব স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে।

(xiii) **এক আত্মা যে শক্তি দ্বারা নানারূপে প্রতীয়মান হন তাহার নাম মায়া ; এ বিষয়ে ঃ—**

শ্বেতাশ্বতর ঃ ৪।১০ ; বৃহদারণ্যক ঃ ২।৫।১৯

(xiv) **জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভেদ ; এ বিষয়ে ঃ—**

ঋগ্‌বেদান্তর্গত ঃ ঐতরেয় উপনিষৎ ৩।১।৩ (প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম)।

শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত ঃ বৃহদারণ্যক „ ১।৪।১০ (অহং ব্রহ্মাস্মি)।

সামবেদান্তর্গত ঃ ছান্দোগ্য „ ৬।৮।৭ (তৎ ত্বমসি)।

অথর্ববেদান্তর্গত ঃ মাণ্ডূক্য „ ২ (অয়মাত্মা ব্রহ্ম)।

উপরে উদ্ধৃত চারিটি বেদের চারিটি বাক্যকে প্রধান মহাবাক্য রূপে গণ্য করা হয়।

(জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্য সকলকে মহাবাক্য বলা হয় ; আর যে সকল শ্রুতিবাক্য আত্মা বা ব্রহ্মের একটিকে মাত্র প্রতিপাদন করে, কিন্তু তাহাদের একত্ব প্রতিপাদন করে না, তাহাদিগকে অবান্তর বাক্য বলা হয়।)

(xv) **(জগৎ মিথ্যা ; ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু—এই জ্ঞান দ্বারা) বাসনার সমূল বিনাশে জীব এই দেহেই অমর হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করে ; এ বিষয়ে ঃ—**

কঠ ঃ ২।৩।১৪ ; বৃহদারণ্যক ঃ ৪।৪।৬

(xvi) **ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞান লাভের ফলে মোক্ষ লাভ হয়, সর্ব কর্মের ক্ষয় স্বাভাবিক ভাবেই হয় ; এ বিষয়ে ঃ—**

মুণ্ডক ঃ ২।২।৯ ; বৃহদারণ্যক ঃ ৪।৫।১৫

(xvii) **সাধারণ অজ্ঞ জীবগণও যে খণ্ড আনন্দ লইয়া জীবন ধারণ করে তাহাও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ ; এ বিষয়ে ঃ—**

বৃহদারণ্যক ঃ ৪।৩।৩২

(xviii) **আনন্দের জন্য ভিন্ন লোকে কর্ম করে না; এ বিষয়ে ঃ—**

ছান্দোগ্য ঃ ৭।২২।১

(xix) **একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই অভয়, অমৃতত্ব ও পরমানন্দ লাভ হয় এবং দুঃখ, শোক প্রভৃতির অবসান হয়; অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ লাভ শুধু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই হয়; (অন্য কোনও উপায়ে নহে); এ বিষয়ে ঃ—**

কঠ ঃ ১।২।১২ ; ২।১।১১ ; তৈত্তিরীয় ঃ ২।৭ ; ২।৯ ; শ্বেতাশ্বতর ঃ ৩।৮ ; ছান্দোগ্য ঃ ৭।১।৩ ; বৃহদারণ্যক ঃ ১।৪।২ ; ৪।৪।১৪

॥ চার ॥

প্রমাণ হিসাবে, শ্রুতি-প্রমাণের অধিক আর প্রমাণ নাই। কিন্তু পাঠকের সম্ভাব্য কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পুরাণ ও তন্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। পুরাণ গ্রন্থসকলের উদ্দেশ্য নানা রূপ কাহিনীর সাহায্যে জনসাধারণকে চিত্তশুদ্ধিক্রমে, অর্থাৎ চিত্তে বৈরাগ্য ও ধ্যানাদিতে নিষ্ঠা উৎপন্ন করাইয়া ধীরে ধীরে অদ্বৈততত্ত্ব ধারণা করিতে সক্ষম করিয়া তোলা। জ্ঞানে পৌঁছিয়া সাধক পুরাণের এই অমূল্য অবদান সহজেই উপলব্ধি করেন। পুরাণের উপরোক্ত উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিলে সহজেই বুঝা যায় যে উহাতে সোজাসুজি অদ্বৈততত্ত্বের উল্লেখ থাকিবার কথা নয়। তথাপি, অনেক বিখ্যাত পুরাণের স্থানে স্থানে অদ্বৈততত্ত্বের সরাসরি অবতারণাও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, বিষ্ণুপুরাণে আছে ঃ—

তস্মিন্ ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মভেদ-
বিভিন্ন চিত্তৈর্বহুধাঽভ্যুপেতম্॥

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোক-
মশেষলোভাদি নিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ
স বাসুদেবো ন সতোঽন্যদস্তি ॥

অর্থাৎ, অতএব, হে দ্বিজ, বিজ্ঞান বা মানস সঙ্কল্প ব্যতীত কোথাও কোনও বস্তু নাই। নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্মানুসারে বিভিন্ন প্রকার চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন মনুষ্যগণ বিজ্ঞানরূপ একমাত্র বস্তুকেই বহুরূপে গ্রহণ করিতেছে। রাগদ্বেষাদি মলরহিত, শোকসম্পর্কশূন্য সর্বদা একরূপ বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, সর্বোত্তম, পরমেশ্বর বাসুদেবই শুধু আছেন ; তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

বিষ্ণুপুরাণে এরূপ আরও অনেক উক্তি আছে। অন্যান্য বহু পুরাণেও, যথা, বিষ্ণুধর্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শিবধর্মোত্তরপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, পরাশরপুরাণ প্রভৃতিতেও এই প্রকার উক্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারত একখানি শ্রেষ্ঠ পুরাণ গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইহার মর্মস্থলস্বরূপ। সুতরাং মহাভারত যে মূলতঃ অদ্বৈত প্রতিপাদক গ্রন্থ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহাভারতের অন্যান্য বহু স্থলেও অদ্বৈততত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলের বিস্তৃত উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। সুতরাং, শান্তিপর্বে ভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র হইতে কয়েকটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

চৈতন্যং সর্বতো নিত্যং সর্বপ্রাণিহৃদি স্থিতম্।
সর্বাতীততরং সূক্ষ্মং তস্মৈ সূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ॥ ৬৮
যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো দেবস্তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥ ৭০
যঃ সর্বপ্রাণিনাং দেহে সাক্ষিভূতো হ্যবস্থিতঃ।
অক্ষরঃ ক্ষরমানানাং তস্মৈ সাক্ষ্যাত্মনে নমঃ ॥ ৯৪

ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ ব্যাপ্তং সর্বং ত্বয়া বিভো।
অব্যক্তং ব্রাহ্মণং রূপং ব্যক্তমেতচ্চরাচরম্॥ ১০৫

অর্থাৎ, যিনি চৈতন্যরূপে সর্বত্র বিদ্যমান্, যিনি নিত্য, যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজিত, সেই সর্বাতীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূক্ষ্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহাতে সব কিছু স্থিত, যাঁহা হইতে সব কিছুর উৎপত্তি, যিনি সর্ব রূপধারী, যিনি সর্বত্র বিদ্যমান্, যিনি সর্বময় দেব—সর্বাত্মা সেই ভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি। যিনি সকল প্রাণীর দেহে সাক্ষীরূপে অবস্থিত থাকিয়া সব কিছুর জ্ঞাতা, দেহাদি যাবতীয় ক্ষয়বস্তুর মধ্যে যিনি অক্ষর—সেই সাক্ষীস্বরূপ ঈশ্বরকে আমি প্রণাম করি। হে বিভো! তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সব কিছু ব্যাপিয়া রহিয়াছ। ব্রহ্ম আপনার অব্যক্তরূপ এবং এই বিশ্বচরাচর আপনার ব্যক্ত রূপ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত আর একখানি বিখ্যাত পুরাণগ্রন্থ। অতীব আক্ষেপের বিষয় এই যে অনেক আধুনিক উগ্র দ্বৈতবাদী এই গ্রন্থকে অদ্বৈততত্ত্বের বিরোধী বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হন এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বাংলায় অনুবাদকালে অনেক শ্লোকের অর্থকে বিকৃত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক ভক্ত পাঠক এইরূপে বিভ্রান্ত হন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এবং বক্তব্য সম্বন্ধে আমরা এখানে দুই একটি কথা বলিব। পূর্বোক্ত পর্যায়ের বৈষ্ণবেরা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেই দেখা যায়—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোঽপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ ১১।২০।৬
নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥ ১১।২০।৭

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধশ্চ যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ১১।২০।৮

অর্থাৎ, মানবের শ্রেয়ঃসাধন মানসে আমি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় কিছু নাই। ইহাদের মধ্যে, অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্, কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষে জ্ঞানযোগ প্রকৃত পথ। অপর পক্ষে, যাহাদের বৈরাগ্যের নিতান্ত অভাব, সে সকল কামিদের পক্ষে কর্মযোগই উপযুক্ত। আর যাঁহারা ভগবৎ কথায় স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধাবান্ এবং যাঁহারা অত্যন্ত বৈরাগ্যবানও নন বা নিতান্ত আসক্তচিত্তও নন এইরূপ (মধ্যম শ্রেণীর) সাধকের পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিলাভের উপায়।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানকে হীন তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য সকলে ঐ পথের অধিকারী নন, একথাও সর্বজনস্বীকৃত।

মোক্ষসাধনে চিত্তশুদ্ধিই শ্রমসাধ্য ব্যাপার। বলিতে গেলে চিত্তশুদ্ধির প্রচেষ্টাকেই সাধন বলা যাইতে পারে। বহু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এজন্য বহু কষ্ট ও বহু চেষ্টা করিতে হয়। সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত-ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তো এক মুহূর্তের ব্যাপার; শুধু শ্রবণের অপেক্ষা। সুতরাং পুরাণগ্রন্থ সকলে এই চিত্তশুদ্ধির প্রতিই সমধিক অভিনিবেশ প্রদান করা হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভগবান্ ব্যাসদেব নাতিশুদ্ধ, নাতিমলিনচিত্ত সাধক যাহাতে ভক্তিপথে প্রথমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অবশেষে জ্ঞান দ্বারা অদ্বয় ব্রহ্মরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন তাহারই উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ঐ গ্রন্থেরই শেষ অংশে বিবৃত আছে। বলা হইয়াছে:—

সর্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥ ১২।১৩।১২

অর্থাৎ, সমস্ত বেদান্তের যে সার কথা, সেই জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ তত্ত্ব বা বস্তুই এই গ্রন্থের একমাত্র বিষয়। জীবের কৈবল্যলাভই ইহার একমাত্র প্রয়োজন—অর্থাৎ ফল।

জীব সিদ্ধিলাভ করিলে কি হয়, এ বিষয়ে ভাগবত বলেন (মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব) ঃ—

ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥ ১২।৫।৫

অর্থাৎ, ঘট ভগ্ন হইলে ঘটের মধ্যস্থ আকাশ যেমন মহাকাশের সহিত একাকার হইয়া যায়, সেইরূপ, (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ) দেহের অবসানে জীব পুনরায় ব্রহ্মই হইয়া যায়। (বলা বাহুল্য, ইহা অদ্বৈতবাদীরই সিদ্ধান্ত। দ্বৈতবাদীরা বলেন যে মুক্তির পরও জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা থাকে ; জীব কখনও ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় না।)

চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্য ভক্তি ও উপাসনার উপদেশ ভাগবতের পূর্ব পূর্ব অংশে স্বাভাবিক ভাবেই আছে ; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি লাভের পর পরম অভয়পদ বা মোক্ষ লাভের জন্য মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি ভগবান্ শুকদেবের চরম, অর্থাৎ শেষ উপদেশ এই ঃ—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥ ১২।৫।১১
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষসি শরীরং চ বিশ্বং চ পৃথগাত্মনঃ॥ ১২।৫।১২

অর্থাৎ, "আমিই সকলের আশ্রয় পূর্ণ ব্রহ্ম ; আমিই পরম প্রাপ্য বস্তু ব্রহ্ম" এই সত্য উপলব্ধি করিয়া এবং এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিজ চিত্তকে নিষ্কল পরমাত্মাতে স্থাপন করিবেন (ব্রহ্মের সহিত একীভূত করিবেন)। তাহা হইলে আপনি লেলিহান, বিষপূর্ণানন, দংশনকারী তক্ষককে, নিজ শরীরকে—এমনকি সমগ্র বিশ্বকে আর নিজ আত্মা হইতে পৃথক্ রূপে দর্শন করিবেন না। (অর্থাৎ, এ সকলকেই

আনন্দস্বরূপ নিজ আত্মারূপেই অনুভব করিবেন।) ভক্তি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত মহারাজ পরীক্ষিতের এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণে যে অবস্থা হইল তাহার বর্ণনা করিয়া তিনি নিজে বলিতেছেন ঃ—

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥ ১২।৬।৫

অর্থাৎ, হে ভগবন্ (শুকদেব !), তক্ষকাদি মৃত্যুর কারণ হইতে আর আমি ভীত হইতেছি না ; যেহেতু আমি এখন আপনার প্রদর্শিত পথে অভয়স্বরূপ ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হইয়াছি।

এই অবস্থায়ই তাঁহার দেহ (অপর লোকের দৃষ্টিতে), সর্পাঘাতে দগ্ধ হইয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অন্যান্য বহু স্থলেও জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং জগৎ যে স্বপ্নসম মিথ্যা একথারও উল্লেখ আছে। স্থানাভাবে ঐরূপ বহু শ্লোকের মাত্র তিনটি শ্লোক এখানে উল্লিখিত হইল ঃ—

আত্মানমেবাত্মতয়াবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥ ১০।১৪।২৫

তদ্ ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে॥ ১০।৮৮।১০

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়া মনোময়ম্॥ ১১।৭।৭

অর্থাৎ, পরমাত্মাকে যাহারা নিজাত্মারূপে জানে না, এই অজ্ঞান হইতেই তাহাদের নিকট বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব হয়। আবার জ্ঞানলাভ হইলে সেই বিশ্বপ্রপঞ্চ (নিজ আত্মাতেই) বিলীন হইয়া যায়। ঠিক যেমন অজ্ঞান হইতেই রজ্জুতে সর্পদেহ জাত হয় এবং রজ্জুজ্ঞান হইলে সেই সর্প (রজ্জুতেই) বিলীন হইয়া যায়। সেই পরম সূক্ষ্ম, শুদ্ধ,

সৎ, চিৎ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে নিজের আত্মারূপে জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন। মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণাদি দ্বারা গ্রাহ্য এই যে নশ্বর দৃশ্যমান জগৎ—তাহাকে মায়াময় মনোব্যাপার মাত্র বলিয়া বুঝিবে।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতও যে মুখ্যতঃ অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপাদক গ্রন্থ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

॥ পাঁচ ॥

তন্ত্র সম্বন্ধে লক্ষ্যণীয় এই যে তন্ত্রসকলের সাধনপদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধককে ধীরে ধীরে শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি করান—অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সে সকলই এক ব্রহ্মশক্তিরই বিভিন্ন রূপ মাত্র—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করান। শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্যই। শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্বের ঠিক ঠিক উপলব্ধি হইলে, পরে বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি অতি সহজেই হইতে পারে। কয়েকটি প্রধান প্রধান তন্ত্রে আবার চরম তত্ত্ব হিসাবে বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা ঃ—

কুর্বাণঃ সততং কর্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্ জ্ঞানং ন বিন্দতি ॥ ১১১
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্মলাত্মনাম্ ॥ ১১২
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥ ১১৩
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধনাৎ ॥ ১১৪
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ ১১৫

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎ পরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥ ১১৬
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমা ধমা॥ ১২২
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥ ১২৩
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিং তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈঃ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥ ১২৪
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যান-ধারণা॥ ১২৫
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥ ১২৬
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মান্ মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ॥ ১২৭
প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে॥ ১৩৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্যমানে ত্রিতয়ে হ্যাত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥ ১৩৮
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র ঃ চতুর্দশোল্লাস

অর্থাৎ, (দেবী ভগবতীকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের প্রতি শিবের উপদেশ) ঃ—যে পর্যন্ত না জ্ঞান হয়, সে পর্যন্ত জীব শত শত কষ্ট স্বীকারপূর্বক নিরন্তর কর্মানুষ্ঠান করিয়াও মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। তত্ত্ববিচার দ্বারা এবং নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা আবরণ-শক্তিসম্পন্ন তমোরাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইলে এবং হৃদয়াকাশ

নির্মল ও শুদ্ধসত্ত্বময় হইলে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্যন্ত সমুদয় জগৎই মায়া দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছে; একমাত্র পরম ব্রহ্মই সত্য। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা অবগত হইয়াই নিরন্তর নিত্যসুখ সম্ভোগ করেন। যিনি নামরূপ পরিত্যাগপূর্বক নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন, তিনিই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। জপ করিলে মুক্তি হয় না, হোম করিলেও মুক্তি হয় না, শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। "আমি ব্রহ্মই" এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মিলেই তবে দেহী মুক্তি লাভ করে। আত্মা সাক্ষীস্বরূপ, অর্থাৎ শুভাশুভের নির্লিপ্ত দ্রষ্টা। তিনি সত্য, অদ্বিতীয় ও পরাৎপর। তিনি দেহস্থ হইয়াও দৈহিক কার্যে লিপ্ত নহেন। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই জীব মুক্তিভাগী হইতে পারে। ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায়ই মায়াকল্পিত ও মিথ্যা; আমিই সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম—ঈদৃশ ভাব উত্তম কল্প। ধ্যানভাব মধ্যম কল্প। স্তব ও জপ ভাব অধম কল্প। আর বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধম কল্প। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য স্থাপনের নামই যোগ; সেবক ও ঈশ্বরভাব প্রতিপাদনের নামই পূজা; আর যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে যে সমুদায়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নাই, তাঁহার পক্ষে যোগ বা পূজা, কিছুরই আবশ্যকতা নাই। যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমজ্ঞান বিরাজিত রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম, ব্রত প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যকতা নাই। যিনি সর্বত্র একমাত্র সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই দর্শন করেন, তিনি স্বভাবতঃই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে পূজা বা ধ্যান-ধারণা কিছুই সম্ভাবিত হইতে পারে না। যিনি সমুদায়ই ব্রহ্ম এইরূপ দেখিতেছেন, তাঁহার পক্ষে পাপ নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, পুনর্জন্ম নাই, ধ্যেয় নাই, ধ্যাতাও নাই। এই আত্মা সর্বদাই মুক্ত, তিনি কোনও বস্তুতেই লিপ্ত নহেন; তাঁহার আবার

বন্ধন কোথায়? কেনই বা দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ মুক্তি কামনা করে? সকল জীবের পক্ষে আত্মাই পরম প্রেমাস্পদ; আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কোনও বস্তু নাই। শিবে! ইহলোকে অন্য বস্তু বা ব্যক্তি যে প্রিয় বা প্রেমাস্পদ হয় তাহা আত্মসম্বন্ধানুসারেই হইয়া থাকে। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয় কেবল মায়া দ্বারাই প্রতিভাত হয়; পরন্তু এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব বিচার করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন; অপর কিছুই থাকে না। কারণ চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয় এবং চিন্ময় আত্মাই জ্ঞাতা। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনিই আত্মবিৎ।

শুদ্ধ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ একটিমাত্র বস্তুই আছেন—যাঁহাকে ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হয়; অজ্ঞানদশায় সেই একমাত্র বস্তুই নানারূপে, বৈচিত্র্যময় জগদ্‌রূপে দৃষ্ট হয়। প্রথম অধ্যায়ে, সাধারণ সরল যুক্তি দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে এই বিচারধারা ও সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্যগণ কর্তৃক সমর্থিত। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে উহা শ্রুতিসম্মতও বটে। কিন্তু সকল বিচারেরই প্রতিষ্ঠা শেষ পর্য্যন্ত নিজের অনুভবে। অর্থাৎ, যুক্তি-প্রমাণ ও শ্রুতি-প্রমাণ যদি নিজ অনুভবের সহিত মিলিয়া যায় তবেই সিদ্ধান্তে সুনিশ্চিত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়া যাইতে পারে। ভাসা ভাসা ভাবে বা অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তির মতমাত্র রূপে জানিলে কিঞ্চিৎ কৌতূহলতৃপ্তি হইতে পারে; তাহার দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও পরমসুখপ্রাপ্তি হয় না—অর্থাৎ কৃতকৃত্যতা বা মুক্তি লাভ হয় না। এ বিষয়ে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন ঃ—

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনাপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥

—বিবেকচূড়ামণি··· ঃ ৬২

অর্থাৎ, যেমন ঔষধের নামোচ্চারণ মাত্রেই রোগ সারে না, তজ্জন্য ঔষধ সেবন করিতে হয়; সেইরূপ, যদি অপরোক্ষ অনুভূতি না হয়, তবে শুধু "ব্রহ্ম, ব্রহ্ম" এইরূপ বাগাড়ম্বরের দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না।

এমতাবস্থায়, কি করিয়া এই তত্ত্ব অপরোক্ষ অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ বা অনুভূত হয়, সে বিষয়ে কিছু না বলিলে আমাদের বক্তব্য কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অথচ, সাধারণভাবে, সকলের জন্য, এ বিষয়ে কিছু বলাও অত্যন্ত দুরূহ। বস্তুতঃ, প্রত্যক্ষ অনুভব জিনিষটি সাধন জগতের অন্তর্গত; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধকের নিজ সাধন দ্বারাই উহা লভ্য। ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন যখন

কোথাও আর কিছু নাই, তখন এক হিসাবে ব্রহ্ম সর্বদাই সকলের প্রত্যক্ষ। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ জীব তাহাকে চিনিতে না পারিয়া জগদ্রূপে দর্শন করে। সুতরাং এই অজ্ঞান নাশ করাই অপরোক্ষানুভূতির উপায়। কিন্তু এই মূল অজ্ঞান এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে অসংখ্য বাসনাজালে জীব জড়িত থাকে, তাহার মাত্রা ও প্রকৃতি এক এক জীবে এক এক প্রকার। সুতরাং যে জীব যে অবস্থায় বর্তমান তাহার যাত্রা সেইখান হইতেই শুরু করিতে হইবে—অর্থাৎ, প্রত্যেক সাধকের যাত্রাপথ অল্পাধিক পৃথক্—যদিও গন্তব্যস্থল সকলেরই এক। তাই প্রত্যেক সাধকের ব্যক্তিগত অবস্থা বুঝিয়া সদ্‌গুরুই তাহার পথনির্দেশ করিয়া দিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে আচার্যেরা যাহা বলিয়াছেন তাহার দুই একটি কথাই মাত্র এখানে অতি সাধারণভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমেই, অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনার অধিকারী কে—এবিষয়ে কিছু বলিতে হয়; কারণ ইহা সকল সাধকের পক্ষে সমানভাবে উপকারী বা ফলপ্রসূ হয় না। অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সাধনমার্গের শেষ কথা। তাহার পূর্বে দ্বৈতসাধন দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞান লাভের জন্য বুদ্ধিই তো যথেষ্ট; তাহার জন্য আবার চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন কি? কেহ যদি এরূপ মনে করেন, তবে তদুত্তরে বলিতে হয় যে আসক্তি বা দ্বেষ দ্বারা মন কলুষিত থাকিলে সত্যদর্শন হয় না। দুইটি বালক ঝগড়া বা মারামারি করিলে, সব কিছু দেখিয়াও তাহাদের মায়েরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ পুত্রকে নির্দোষ এবং অপরের পুত্রকে দোষী বলিয়া দেখিয়া থাকেন। নিজ পুত্রের দোষ থাকিলেও তাহা দেখিতে পান না। ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের মধ্যে ফুটবল ম্যাচের সময় রেফারী যদি "অফ্-সাইড্" ঘোষণা করেন—তবে এই একই ঘটনা দেখিয়া দুই দলের উৎকট সমর্থকেরা প্রায়শঃই বিপরীত মত পোষণ করেন। রেফারীর ঘোষণায় যে দল লাভবান্ হইল তাহার সমর্থকেরা ইহাকে

ঠিক মনে করেন—অপরপক্ষের সমর্থকেরা রেফারীর এই সিদ্ধান্তকে ভুল বলিয়া ধরিয়া লন। নিজ নিজ পুত্র বা দলের প্রতি আসক্তি এবং অপরের পুত্র বা দলের প্রতি দ্বেষই এই ভুল দর্শনের কারণ। এরূপ স্থুল ব্যাপারেই যখন এরূপ, তখন অদ্বৈততত্ত্বের ন্যায় সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণা করিতে গেলে যে—মন আসক্তি ও দ্বেষশূন্য হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। অত্যন্ত মলিন চিত্তে অদ্বৈতবিচারের ধারণা তো হয়ই না—তাহা শুনিতে ইচ্ছা পর্যন্ত হয় না। সত্যও যদি অপ্রিয় হয়, তবে লোকে তাহা গ্রহণ করিতে চায় না। যাহারা অত্যন্ত বহির্মুখ, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বাহ্য বিষয়ে যাহাদের অত্যন্ত স্পৃহা —তাহারা অদ্বৈতবিচার বুঝা বা গ্রহণ করা তো দূরের কথা—উহা শুনিতেও চায় না। কারণ, সবই যদি এক সমরসতত্ত্ব হইয়া গেল, তবে ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য—কিছুই থাকে না। এমনকি মানসিক ভোগও সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। যাবতীয় ভোগের বিরোধী বলিয়া অদ্বৈততত্ত্ব তাহাদের নিকট অপ্রিয়। সুতরাং জোর করিয়া যদি শুনিতে আরম্ভ করেও, তবে তাহাতে মনোযোগ রক্ষা করিতে পারে না। বহু সাধকই এই পর্যায়ভুক্ত। এরূপ ব্যক্তিকে অদ্বৈত-বিচার শুনাইয়া কোনও লাভ হয় না। এ পথ তাহাদের জন্য নয়। এরূপ ব্যক্তিগণের জন্য শাস্ত্র নানারূপ কর্ম ও উপাসনার বিধান করিয়াছেন। ঐ সকল সাধন দ্বারা বহুলাংশে শুদ্ধচিত্ত হইলে পরে অদ্বৈততত্ত্ব বিচার শুনিবার ও বুঝিবার যোগ্যতা জন্মে, উহা ভাল লাগে ও ফলপ্রসূ হয়।

অপরপক্ষে এমন অতীব শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিও কেহ কেহ আছেন, যিনি একবার মাত্র বেদান্তবিচার শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন অর্থাৎ অপরোক্ষ করিতে পারেন এবং তাহার সত্যতা সম্বন্ধে চিরতরে নিঃসন্দেহ হইয়া যান। এই প্রকার অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির লক্ষণ কি, এ সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে তাঁহার নিম্নলিখিত সাধন-চতুষ্টয় অর্জিত হইয়া থাকে।

(১) জগতের যাবতীয় বিষয়ই অনিত্য ; শুধু ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু—এই বাক্যে বিশ্বাস ;

(২) দুঃখমিশ্রিত ও অনিত্য—এই বোধে ইহলোকের ও পরলোকের যাবতীয় সুখ-ভোগে বিরক্তি ;

(৩) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ছয়টি সম্পদ।

শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম ;

দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম ;

উপরতি—বাহ্য-বিষয় চিন্তা না করা ;

তিতিক্ষা—প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া অম্লানচিত্তে যাবতীয় দুঃখ সহ্য করা ;

শ্রদ্ধা—শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস ;

সমাধান—অন্য চিন্তা না করিয়া সদাসর্বদা শুধু ঈশ্বর চিন্তা করা ;

(৪) মুমুক্ষুতা, অর্থাৎ মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা।

এরূপ ব্যক্তিই যে অদ্বৈতবেদান্তবিচারের মুখ্য অধিকারী তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু, বলা বাহুল্য যে এরূপ সাধক অতীব বিরল।

এই উভয় প্রকার সাধক হইতে ভিন্ন—অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত অত্যন্ত মলিনও নয় এবং অতীব শুদ্ধও নয়—তাহাদের পক্ষে বেদান্তবিচার বিধেয় কি না, এ বিষয়েই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। ইহার সহজ উত্তর এই যে বেদান্তবিচার যাঁহারই ভাল লাগিবে, তিনিই তাহা করিতে পারেন—কারণ, তিনি পূর্বে ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে—চিত্তশুদ্ধিকর প্রচুর সাধন অবশ্যই করিয়াছেন বুঝিতে হইবে ; অন্যথা বেদান্তবিচার শ্রবণে তাঁহার প্রবৃত্তিই হইত না। ইহা শুধু আমাদের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত অভিমত নয়। স্বয়ং আচার্য শঙ্করও এ বিষয়ে বলিয়াছেন :—"সাধনচতুষ্টয়সম্পত্যভাবেঽপি

গৃহস্থানাম্ আত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মানে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্তু অতীব শ্রেয়ো ভবতি।" (আত্মানাত্মবিবেক ঃ ৫৯) অর্থাৎ, "সাধন-চতুষ্টয় যিনি অর্জন করেন নাই, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন নাই—এরূপ ব্যক্তিও যদি আত্মবস্তু কি, অনাত্ম-বস্তুই বা কি এ সকল বিচার করেন, তবে তাঁহার কোনও ক্ষতি তো হয়ই না, বরঞ্চ অতীব কল্যাণই সাধিত হয়।" গৃহস্থের বেলায়ই যখন এরূপ তখন সন্ন্যাসীর বেলায় তো কথাই নাই। অতএব বেদান্ত-বিচারে যিনিই আগ্রহী, অর্থাৎ যিনিই তাহাতে আন্তরিক আনন্দ পান, তিনিই তাহা করিবার অধিকারী। অধিকারী নির্ণয় ব্যাপারে ইহাই আমাদের সরল ও সহজ সিদ্ধান্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য ঃ— অর্জুন জ্ঞানযোগের মুখ্য অধিকারী ছিলেন না ; কর্ম ও উপাসনারই অধিকারী ছিলেন। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি যখন নিজের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া মোহবশতঃ সংসার ও কর্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই ভুল পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার যাহা স্বধর্ম সেই যুদ্ধেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দানে কুণ্ঠিত হন নাই ; বরঞ্চ সর্বপ্রথমে সেই বিষয়েই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানই যে চরম উদ্দেশ্য তাঁহা স্মরণে থাকিলে তবেই কর্ম বা উপাসনা সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে।

এরূপ মধ্যম অধিকারী সাধকবর্গের মধ্যেও অবশ্য চিত্তশুদ্ধির তারতম্যানুসারে অনেক শ্রেণীভেদ থাকিতে বাধ্য। একদিকে, যাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধির স্বল্পতা আছে, তাঁহারা হয়তো এই তত্ত্বের মোটামুটি আভাসমাত্র লাভ করিয়া ও তৎপ্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া চিত্তশুদ্ধির সম্পূর্ণতা লাভের জন্য, কিঞ্চিৎ বিচারসহ নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার প্রতিই সমধিক যত্নবান্ হইবেন। অপর দিকে, যাঁহাদিগের চিত্ত অধিকতর নির্মল, তাঁহারা এই তত্ত্ববিচারে সত্য ও

আনন্দের এমন সন্ধান পাইবেন যে উহাতেই স্বভাবতঃ সমাহিত ও নিমগ্ন হইয়া যাইবেন। তাঁহাদিগের পক্ষে অপর কোনও প্রকার কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন নাই। তবে ঐরূপ অবস্থা স্বাভাবিকরূপে আসিবার পূর্বে জোর করিয়া নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনাদি ত্যাগ করা উচিত নয়। এ সকল ব্যাপারে আন্তরিকতাই সাধকের প্রধান সহায়। আন্তরিক হইলে, ঈশ্বরই অন্তরে থাকিয়া সাধককে সুপথে পরিচালিত করিবেন, কুপথ হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং সদ্‌গ্রন্থ ও সদ্‌গুরুর সহিত যোগাযোগ করিয়া দিবেন।

সাধন জগতে কর্ম ও উপাসনার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তাহার বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়। যাঁহারা বহুলাংশে শুদ্ধচিত্ত, তাঁহাদের পক্ষে বিচারপথে তত্ত্বানুভূতির সাধন বিষয়েই মাত্র দুই একটি কথা এখানে বলা যাইতে পারে। প্রথম কথা এই যে বিচারপথে বা জ্ঞানযোগে বিচারই প্রায় একমাত্র সাধন; অন্য সাধন প্রায় কিছুই নাই। বিচার করা, বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিষ্ঠ হওয়াই এই সাধন। আচার্যগণ এই ব্যাপারটিকে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও নির্বিকল্প-সমাধি—এই চারি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। কথাগুলির অর্থ সংক্ষেপে এইরূপ:—শ্রবণের অর্থ:—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু; জগৎ মিথ্যা এবং নিজ অন্তরে অনুভূত আত্মা ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়, এই সিদ্ধান্তের শ্রবণ; মননের অর্থ:—পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি উঠিতে পারে তাহার আলোচনা করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তই যে প্রকৃত সত্য—এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া; নিদিধ্যাসনের অর্থ:—নামরূপাত্মক বিষয়সকলকে মিথ্যা বুঝিয়া সে সকল হইতে মনকে সংহত করিয়া উপরোক্ত সত্যে অর্থাৎ ব্রহ্মে বা আত্মায় একনিষ্ঠ হওয়া। ঐরূপ করিতে করিতে ঐ সত্যের সহিত এরূপ প্রগাঢ়ভাবে একীভূত হইয়া যাওয়া, যাহার ফলে অন্য সকল প্রকার মানসিক ব্যাপার স্তব্ধ হইয়া যায়—তাহাকে নির্বিকল্প সমাধি বলা যাইতে পারে।

বিচার সম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে বিশদভাবেই বলা হইয়াছে—সুতরাং সে বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে মাত্র দুই একটি মন্তব্য করা যাইতে পারে। জ্ঞাতা কখনও জ্ঞেয় হইতে পারে না—এই যুক্তির সাহায্যে জ্ঞাতা আত্মা যে বাহ্য জগৎ নয়, দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, অহঙ্কারও নয়—উহা কোনও প্রকার নামরূপবান্ দৃশ্যবস্তুই নয়—উহা সম্পূর্ণ নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র—এইটি বুঝাই বিচারের প্রথম অঙ্গ। এখন, বাহ্য জগৎ, দেহ, এমনকি প্রাণও যে দৃশ্য বা জ্ঞেয়—ইহা বুঝিতে কিছু অসুবিধা হইবার কথা নয়; কিন্তু, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারও যে দৃশ্য বা জ্ঞেয়—এই তত্ত্বটি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর। সুতরাং এইটি ঠিক ঠিক বুঝিবার জন্য কিছু চেষ্টার আবশ্যকতা আছে। মন ইত্যাদিকে দৃশ্যরূপে লক্ষ্য করাই এই সাধন।

জ্ঞাতার পক্ষে নিজ হইতে পৃথক্ কিছু প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়, এই যুক্তির সাহায্যে শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মাই অজ্ঞানবশতঃ নানারূপ বিষয়াকারে প্রতিভাত হন, জগদাদি দৃশ্যবস্তুর নামরূপ অংশটি মিথ্যা—উহারা বাস্তবে আত্মচৈতন্যই—এইটি বুঝাই বিচারের দ্বিতীয় অঙ্গ। এইটি বুঝিতে সূক্ষ্মতর বুদ্ধি ও অধিকতর একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইটি বুঝাইবার জন্য অধিকতর প্রয়াস করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে মধ্যম অধিকারী সাধকগণও এই প্রকার বিচারের সাহায্যে তত্ত্বটি বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা একবার বা দুইবার পাঠ করিয়া ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহারা যেন বিষয়টি একান্তে, কোলাহলহীন স্থানে একাগ্রতার সহিত পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে থাকেন। আশা করা যায় যে এইরূপ করিতে করিতে, সাধকের নিজ প্রচেষ্টায় ও ঈশ্বর কৃপায় "জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাতার বাহিরে থাকিতে পারে না—উহা জ্ঞাতার অন্তরেই অবস্থিত" এই মৌলিক তত্ত্বটি একদিন বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় সাধকের চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিবে এবং ইহার ফলে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলিও সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে। তখন তিনি নিজের এই সাফল্যে চমৎকৃত হইয়া অপূর্ব আনন্দে এবং গুরু ও শাস্ত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িবেন।

কোনও কোনও সাধক হয়তো ইতিপূর্বেই তীব্র ধ্যানাদির অভ্যাসফলে নানারূপ জ্যোতিঃ দর্শন বা অশ্রু, পুলক, রোমাঞ্চাদির আবির্ভাবে তীব্র আনন্দের আস্বাদন করিয়া থাকিবেন। সাধনপথে এ সকল দর্শন বা অনুভব নিতান্ত তুচ্ছ নয়—বরঞ্চ অগ্রগতিরই লক্ষণ; কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ সাধকের তখনও নিশ্চয়ই মনে হইয়া থাকিবে যে ইহাই সাধনার শেষ লক্ষ্য হইতে পারে না; যতই সূক্ষ্মাকারে হউক, এ জ্যোতিঃও দৃশ্য, অর্থাৎ ভৌতিক জ্যোতি, এ আনন্দও ইন্দ্রিয় ও মনোগ্রাহ্য—সুতরাং বিষয়ানন্দেরই অন্তর্গত। তাঁহার মনে হইয়া থাকিবে যে ইহার পর আরও কি আছে তাহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এ সকল দর্শন, অনুভবাদিকে লক্ষ্য করিয়া সাধকের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন—"ওরে! আরও এগিয়ে চল!" কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বের অনুভূতি যখন হয়, তখন মনের অন্তঃস্তল হইতে এই বাণীই যেন ফুটিয়া উঠে যে "এতদিনে আমার জানার, অনুভবের শেষ হইল; ইহার অধিক আর জানিবার নাই—অনুভব করিবার নাই। আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি।" তখন পূর্বে শুনিয়াও যাহার মর্ম পরিস্ফুট হয় নাই, নিম্নোক্ত সেই বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়; মনে হয় যেন সাধকের নিজের মনের কথাই এই বাণীতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে:—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডকোপনিষৎ: ২।২।৯

অর্থাৎ, কার্য ও কারণরূপী সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে পর এই সাক্ষাৎকারীর হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদি সংস্কার) নষ্ট হইয়া যায়।

সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষীণ, অর্থাৎ দগ্ধবীজের ন্যায় হইয়া যায়।

অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত বিশ্বজগৎ চিৎস্বরূপ আমার আত্মাই—এইটা নিজের অন্তর দিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বা অপরোক্ষ অনুভূতি বলা যাইতে পারে। এইরূপ অনুভব এক মুহূর্তের জন্যও উদিত হওয়া বহু জন্মের সুকৃতি ও সাধনার ফলেই সম্ভব হইতে পারে। তথাপি ঐ জ্ঞান অতি বিরল দুই একজন অবতার বা আধিকারিকপ্রতিম অতি শুদ্ধচিত্ত পুরুষ ভিন্ন একবারেই দৃঢ়ভিত্তিক হয় না ; অর্থাৎ ঐ জ্ঞান সর্বদা সমভাবে জাগরূক থাকে না। ঐ জ্ঞান এক মুহূর্তের জন্য আসিয়া পর মুহূর্তেই চিরতরের জন্যই বুঝি বা মিলাইয়া যায়—এইরূপ আশঙ্কাই বরঞ্চ প্রথম প্রথম হয়; এবং ঐ জ্ঞানানন্দের বিরহে সাধক মুহ্যমান হইয়া পুনরায় উহা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতে থাকেন। তাই তো বলা হইয়াছে ঃ—

অনৌপম্যমনির্দেশ্যমব্যক্তং নিশ্চলং মহৎ।
যথা ব্রহ্ম তথা তস্য বিরহ-বেদনং ভৃশম্॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম যেরূপ অনুপম, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, নিশ্চল ও অতি মহান্, ব্রহ্মানুভূতির স্বাদ যিনি একবার পাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ঐ অনুভূতির অভাবও অতি ভীষণ ও অসহ্য বেদনাদায়ক। সুখের ও ভরসার বিষয় এই যে একবার উদিত হইলে ঐ জ্ঞান আর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু ঐ জ্ঞান যদি সদা সর্বদাই স্ফূরিত হইতে থাকে, তবেই তাহার সার্থকতা। সুতরাং যাহাতে এ জ্ঞান অবিছিন্ন ধারায় প্রবাহিত থাকে, তজ্জন্য নিরন্তর শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে বিদ্যারণ্য মুনি "পঞ্চদশী" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ—

দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্।
পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাৎ তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি॥ ২।১০৭

প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা।
ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষ্যতে ॥ ২।১০৮
বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্ দেহাদিদ্বাত্মধীঃ ক্ষণাৎ।
পুনঃ পুনরুদেত্যেবং জগৎসত্যত্বধীরপি ॥ ৭।১০৩
বিপরীতা ভাবনেয়মৈকাগ্র্যাৎ সা নিবর্ত্ততে।
তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ ॥ ৭।১০৪
উপাস্তয়োঽত এবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেঽপি চিন্তিতাঃ।
প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাদ্ ব্রহ্মাভ্যাসেন তদ্ ভবেৎ ॥ ৭।১০৫
তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৭।১০৬
অস্তু বোধোঽপরোক্ষোঽত্র মহাবাক্যাৎ তথাপ্যসৌ।
ন দৃঢ়ঃ শ্রবণাদীনামাচার্য্যৈঃ পুনরীরণাৎ ॥ ৭।৯৭

অর্থাৎ, প্রতিদিন স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে সে দিনের অধীত বিদ্যা বিস্মৃত হয় বটে, কিন্তু পরদিন জাগিয়া উঠিলে যেমন উহা অনধীত থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান একবার উদিত হইলে উহা আর সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। প্রমাণবলে উৎপাদিত বিদ্যা প্রবলতর বিপরীত প্রমাণ দ্বারা ভিন্ন (অর্থাৎ, শুধু সাময়িক বিস্মৃতির দ্বারা) বিনষ্ট হয় না। কিন্তু বেদান্ত অপেক্ষা প্রবলতর প্রমাণ আর কিছু নাই। (সুতরাং বেদান্ত-বিচার দ্বারা উৎপাদিত তত্ত্বজ্ঞান আর নষ্ট হইবার নয়।) কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের দৃঢ় সংস্কারের বশে স্থূল, সূক্ষ্ম দেহাদিতে "আমি, আমার"—বুদ্ধি ও জগৎ সত্যই আছে এরূপ বুদ্ধি মুহূর্তের অনবধানতার অবসরেই পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে চায়। এ সকলকে বিপরীত ভাবনা বলা হয় এবং তত্ত্বে একাগ্রতার দ্বারা উহাকে নিবৃত্ত করিতে হয়। এই একাগ্রতা, সাধারণতঃ তত্ত্বোপদেশ লাভের পূর্বেই, সগুণ-ঈশ্বরের উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা আয়ত্বীভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই ব্রহ্মশাস্ত্রেও নানারূপ সগুণ ঈশ্বরোপাসনার বিধান রহিয়াছে। আর যদি কোনও সাধক তত্ত্বোপদেশ লাভের পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণে

উপাসনাদির অভ্যাস না করিয়া থাকেন, তবে ব্রহ্মাভ্যাসের দ্বারাই তাঁহার এই একাগ্রতা অর্জিত হইবে। ব্রহ্মাভ্যাসের অর্থ :—ব্রহ্মের স্বরূপের চিন্তা, তদ্বিষয়ক বাক্যের আলোচনা, বিচারের সাহায্যে পরস্পরকে তাহা বোধগম্যকরণ এবং তাহাতে একনিষ্ঠ হওয়া। জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধক শ্রুতিবাক্য সকলের (মহাবাক্য সকলের) বিচার দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় বটে, তথাপি প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান দৃঢ় হয় না। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে জ্ঞান লাভের পরেও শ্রবণাদির অভ্যাস করিতে শঙ্করাদি আচার্যগণ উপদেশ করিয়াছেন।

শঙ্করাদি আচার্যগণের উপদেশকেই যখন বিদ্যারণ্য মুনিও প্রমাণ-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আচার্য শঙ্করের উপদেশ কি প্রকার তাহা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আচার্য এরূপ উপদেশ অসংখ্য স্থলেই দিয়াছেন। তাহার অতি অল্প কয়েকটি মাত্রই এখানে উল্লেখ করা সম্ভব। আচার্যের সিদ্ধান্ত ও সাধন-বিষয়ক কয়েকটি উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মুঞ্জাদিষীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ
প্রত্যঞ্চমাত্মানমসঙ্গমক্রিয়ম্।
বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্বং
তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ॥

বিবেকচূড়ামণি—১৫৩

অর্থাৎ, মুঞ্জনামক তৃণ হইতে তাহার ডাঁটাটি বাহির করিবার জন্য তাহার উপরকার আবরণগুলি যেমন ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ (দেহ, প্রাণ, মন, অহঙ্কার প্রভৃতি) অনাত্ম দৃশ্যবর্গ হইতে (বিচার সহায়ে) দ্রষ্টা প্রত্যক্ আত্মাকে নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় ও পৃথক্‌রূপে জানিয়া এবং তদনন্তর (শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ) সেই আত্মাতে সকল অনাত্মবস্তুকে বিলীন করিয়া (অর্থাৎ, আত্মাই অজ্ঞানবশতঃ ঐ সকল দৃশ্যরূপে প্রতীত হন—বাস্তবিক আত্মার অতিরিক্ত অপর কোনও

বিষয় নাই ইহা বুঝিয়া) সেই আত্মার (বা ব্রহ্মের) সহিত অভেদ-ভাবে যে সাধক অবস্থান করেন, তিনি মুক্তি লাভ করেন।

বিচারের উভয় অঙ্গই এবং সাধনবিষয়ক উপদেশেরও সারটুকু এই একটিমাত্র শ্লোকেই নিবদ্ধ আছে। আত্মানুভূতির সাধন বলিতে এইটুকুই—কিন্তু ইহা বড় সহজ ব্যাপার নয়, কারণ বিষয়টি অতিশয় সূক্ষ্ম ; অথচ উহা সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে হইবে ; কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক বা অস্পষ্টতা থাকিলে চলিবে না। তাই আচার্য বলিয়াছেন :—

অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং
ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।
সমাধিনাত্যন্তসুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা
জ্ঞাতব্যমার্য্যেরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ॥

বিবেকচূড়ামণি—৩৬০

অর্থাৎ, পরমাত্মতত্ত্ব বা আত্মার স্বরূপ অতীব সূক্ষ্ম। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উহা উপলব্ধি করিতে পারে না। অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত মহামনা ব্যক্তিগণই একাগ্রতার অভ্যাসে প্রাপ্ত অতি সূক্ষ্ম বৃত্তির দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ
পক্ষৌ বিজানীহি বিচক্ষণ ত্বম্।
বিমুক্তিসৌধাগ্রতলাধিরোহণং
তাভ্যাং বিনা নান্যতরেণ সিধ্যতি॥

বিবেকচূড়ামণি—৩৭৪

অর্থাৎ, উড়িবার জন্য পক্ষীর যেমন দুইটি ডানারই সমান প্রয়োজন হয়, বিচারপথের সাধকেরও তদ্রূপ বৈরাগ্য এবং বোধ (অর্থাৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধি) এ দুইটিরই সমান প্রয়োজন। ইহাদের একটির অভাবে শুধু অপরটির দ্বারা মুক্তিরূপ সৌধের শিখরারোহণ করা সম্ভব নয়।

(বৈরাগ্যের অভাব থাকিলে মন বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইতেই চাহে না ; আবার বৈরাগ্যবশতঃ মন বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইবার চেষ্টা করিলেও, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব থাকিলে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বের ধারণা হয় না।)

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ
সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ।
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তি-
র্মুক্তাত্মনো নিত্যসুখানুভূতিঃ॥

বিবেকচূড়ামণি—৩৭৫

অর্থাৎ, তীব্র বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরই সমাধি হইয়া থাকে ; সমাহিত ব্যক্তিরই দৃঢ় তত্ত্বজ্ঞান হয় ; তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং মুক্ত ব্যক্তিরই নিত্যসুখ লাভ হইয়া থাকে।

বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা
মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো
বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ॥

বিবেকচূড়ামণি—৩৩৫

অর্থাৎ, (মিথ্যাজ্ঞানে) বিষয়চিন্তা বর্জিত হইলে মন স্বচ্ছ ও নির্মল হয়। মন স্বচ্ছ ও নির্মল হইলে পরমাত্মার (আত্মা হইতে অভেদ-রূপে) দর্শন হয়। এই দর্শনের ফলে ভববন্ধনের অবসান হয়। সুতরাং, (বিষয় মিথ্যা—এই জ্ঞানাবলম্বনে) বিষয়চিন্তা বর্জনই মুক্তিলাভের উপায়।

জ্ঞাতে বস্তুন্যপি বলবতী বাসনানাদিরেষা
কর্তাভোক্তাপ্যহমিতি দৃঢ়া যাস্য সংসারহেতুঃ।
প্রত্যগ্‌দৃষ্ট্যাত্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযত্নান্
মুক্তিং প্রাহুস্তদিহ মুনয়ো বাসনাতানবং যৎ॥

বিবেকচূড়ামণি—২৬৭

অর্থাৎ, বস্তুর (অর্থাৎ, ব্রহ্মের বা আত্মার) স্বরূপ (অপরোক্ষভাবে) জ্ঞাত হইলেও (ঐ জ্ঞান প্রথম প্রথম দৃঢ় হয় না ; এবং) "আমি কর্তা, আমি সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা" অর্থাৎ কর্তা-ভোক্তা আমি বা কাঁচা আমি বা অহংকারই যে প্রকৃত আমি এই প্রকারের যে (অনাদি অজ্ঞানজাত সংস্কার বা) বাসনা জীবের জন্মমৃত্যুরূপ সংসারগতির কারণ (তাহা সহসা যাইতে চাহে না ; সুতরাং) সাধক আত্মনিষ্ঠ হইয়া অর্থাৎ সাক্ষী স্বরূপে বর্তমান থাকিয়া সেই বাসনার লেশকে যত্নসহকারে অপসারিত করিবেন। এ জীবনে বাসনার নিঃশেষে ক্ষয়কেই মুনিগণ মুক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

সাধক দীর্ঘকাল নিরলসভাবে এইরূপ অভ্যাসে রত থাকিবেন—উহাতে কখনও বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা অবহেলা করিবেন না—ইহা পিতৃসুলভ হিতাকাঙ্ক্ষায় আচার্য বহু ভাবে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন। এখানে তাহার অতি অল্প কয়েকটিকেই মাত্র উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল :—

যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মন-
স্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাঃ।
নিঃশেষমোক্ষে সতি বাহ্যবাসনানা-
মাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা॥

বিবেকচূড়ামণি—২৭৬

অর্থাৎ, মন যেমন যেমন সাক্ষীরূপ নিজ আত্মাতে স্থিত হয়, সেই সেই পরিমাণে সে অনাত্ম—অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ভোগের বাসনাসকল পরিত্যাগ করে। (এইরূপ অভ্যাসের ফলে) বাসনাসমূহের নিঃশেষে নাশ হইলে পর আত্মস্বরূপের অনুভব প্রতিবন্ধকশূন্য ভাবে হইয়া থাকে।

দৃশ্যং প্রতীতং প্রবিলাপয়ন্ স্বয়ং
সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্।

সমাহিতঃ সন্ বহিরন্তরং বা
কালং নয়েথাঃ সতি কর্মবন্ধে ॥

বিবেকচূড়ামণি—৩২০

অর্থাৎ, বাহ্যরূপে বা আন্তররূপে প্রকাশমান্ দৃশ্য বা বিষয়সমূহকে (বিচার দ্বারা মিথ্যাবোধে) নিরসন করিয়া আনন্দস্বরূপ, অবিনাশী স্বীয় স্বরূপের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া (ও বিষয়চিন্তা না করিয়া) প্রারব্ধক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ আজীবন এইভাবে) সাধক কাল যাপন করিবেন।

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩২১
ন প্রমাদানর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।
ততো মোহস্ততোঽহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা ॥ ৩২২
যথাপকৃষ্টশৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি।
আবৃণোতি তথা মায়া প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্মুখম্ ॥ ৩২৪
অতঃ প্রমাদান্ ন পরোঽস্তি মৃত্যু-
র্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।
সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্
সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ ॥ ৩২৮

—বিবেকচূড়ামণি

অর্থাৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠায় কখনও আলস্য করিবে না। ব্রহ্মার মানসপুত্র (সনৎকুমার) বলিয়াছেন—"প্রমাদই মৃত্যু"। জ্ঞানী সাধকের পক্ষে আত্মচিন্তনে অবহেলার মত অনর্থকারী আর কিছুই নাই। স্বরূপ-চিন্তনে অবহেলা হইতে মোহের উৎপত্তি হয়; মোহ হইতে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি আসে এবং তাহা হইতে সংসার বন্ধন ও তাহা হইতেই নানারূপ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। (কোনও পুষ্করিণীর জলের উপরকার) শেওলা সরাইয়া দিলেও তাহা যেমন এক মুহূর্ত্তও স্থির

থাকে না, আবার আসিয়া (পরিষ্কার জলকে) ঢাকিয়া ফেলে, মায়াও সেইরূপ ক্ষণকালের মধ্যেই আত্মচিন্তনে বিমুখ জ্ঞানীর চিত্তকে অজ্ঞানে আবৃত করিয়া ফেলে। অতএব বিবেকবান্ ব্রহ্মবিদের পক্ষে সমাধি অভ্যাসে অনবধানতার ন্যায় মৃত্যুতুল্য দুঃখদায়ক আর কিছুই নাই। অপরপক্ষে, তিনি যদি সদা সর্বদা আত্মনিষ্ঠ থাকেন তবে তাঁহার সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অতএব সাধক সাবধান হইয়া সর্বদা সমাহিত থাকিতে যত্ন করিবেন।

নিমেষার্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ॥ ১৩৪
অদৃশ্যং ভাবরূপঞ্চ সর্বমেব চিদাত্মকম্।
সাবধানতয়া নিত্যং স্বাত্মানং ভাবয়েদ্ বুধঃ॥ ১৪১

—অপরোক্ষানুভূতি

অর্থাৎ, ব্রহ্মাদি, সনকাদি ও শুকাদি যেমন এক মুহূর্তকালও ব্রহ্মচিন্তন বিনা অতিবাহিত করেন না, সাধকও সেইরূপ হইবেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি নামরূপবিহীনরূপেই হউক, অথবা নামরূপবিশিষ্ট-রূপেই হউক, যাহা কিছুই অনুভব করিবেন, সে সকলই যে চিৎস্বরূপ নিজ আত্মাই—একথা সাবধানে সর্বদা স্মরণ রাখিবেন।

এক্ষণে আচার্য শঙ্করের পরমগুরু আচার্য গৌড়পাদ এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব :—

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ॥

বৈতথ্যপ্রকরণ—৩৮

সুখমাব্রিয়তে নিত্যং দুঃখং বিব্রিয়তে সদা।
যস্য কস্য চ ধর্মস্য গ্রহেন ভগবানসৌ॥

অলাতশান্তিপ্রকরণ—৮২

মাণ্ডূক্য-কারিকা

অর্থাৎ, সাধক তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর আন্তর বা বাহ্য সকল দৃশ্যকেই নিজ চিৎস্বরূপ আত্মারূপে দর্শন করিবার ফলে নিজে ঐ তত্ত্বস্বরূপই হইয়া যান এবং (কোনও অনাত্মবস্তুতে প্রীতিলাভ না করিয়া) আত্মারাম হইয়া যান, অর্থাৎ শুধু আত্মাতেই প্রীতিলাভ করেন। তিনি আর ঐ তত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হন না। (যাঁহার এ অবস্থা লাভ এখনও হয় নাই, তিনি ইহা লাভের জন্য নিরন্তর প্রযত্ন করিবেন, ইহাই ভাবার্থ।) যে কোনও অনাত্ম বিষয়কেই সত্যবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবামাত্রই এই ভগবান্, অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ আত্মা যেন অনায়াসেই আবৃত হইয়া যান। আত্মতত্ত্বকে নিরাবরণ করাটাই দুঃসাধ্য। (সুতরাং সাধক সর্বদা শুদ্ধ আত্মতত্ত্বেই জাগরূক থাকিবেন এবং কখনও নামরূপের মোহে পড়িবেন না—ইহাই উপদেশ।)

বিচার প্রথমে পুনঃ পুনঃ বিশদভাবেই করিতে হয়—যাহাতে উহাতে কোনও রূপ অস্পষ্টতা না থাকে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিচারের ফলে ধীরে ধীরে তত্ত্বটি যখন আয়ত্তে আসিয়া যায় তখন আর দীর্ঘ বিচারের আবশ্যক হয় না। তখন সিদ্ধান্তবাক্য শ্রবণ বা স্মরণ করিলেই তাহা সত্য বলিয়া অনুভব হয়। সমাধির অভ্যাসে এই সত্য চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং বিপরীত সংস্কার বা বাসনাসকল দূরীভূত হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখানে যে নির্বিকল্প সমাধির কথা বলা হইল তাহা বিচারোদ্ভূত সত্যে বা তত্ত্বে দৃঢ়নিষ্ঠ হইবার ফল; অন্য কোনও উপায়ে—অর্থাৎ, বিচারজাত সত্য অবলম্বন না করিয়া অন্য কোনও যৌগিক উপায়ে সকল প্রকার চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা নহে। আত্মার অতিরিক্ত অপর বস্তুসকল সত্যই আছে—অজ্ঞানজাত এই বিশ্বাসই যাবতীয় দুঃখ ও বন্ধনের মূল। এই ভুল ধারণা দূর করিয়া মুক্তি লাভের জন্য ঠিক ধারণার—অর্থাৎ জ্ঞানের অর্থাৎ বিদ্যাবৃত্তিরই প্রয়োজন; বৃত্তির অভাব নহে। সুতরাং বিচার-মার্গে যেন তেন প্রকারেণ বৃত্তি-নিরোধ করাটাই উদ্দেশ্য নহে; সব কিছুই, এমনকি চিত্তবৃত্তিও যে শুদ্ধ ব্রহ্মই—এইটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি

করাটাই উদ্দেশ্য। সমাধির অভ্যাসও এই উদ্দেশ্যেই। এ সমাধি বিচারেরই অঙ্গ—গভীর বিচারেরই স্বাভাবিক পরিণতি। জ্ঞানযোগে সমাধির অর্থ সমাধান। এ বিষয়ে আচার্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন ঃ—

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্॥

—মাণ্ডূক্য-কারিকা ঃ অদ্বৈত-প্রকরণ—৩২

অর্থাৎ, আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু; (দৃশ্যবর্গ মিথ্যা; আত্মাই মায়াবশতঃ দৃশ্যাকারে প্রতীত হন)—এই তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে অনুভূত হইলে মন আর সঙ্কল্প করে না (দৃশ্যের আকার গ্রহণ করে না)। তখন মন অ-মন হইয়া যায়, কারণ তখন গ্রহণযোগ্য কোনও বিষয়ই থাকে না, যাহা সে গ্রহণ করিতে পারে। বিদ্যারণ্য মুনিও বলিয়াছেন ঃ—

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্।
সম্পন্নং চেৎ তদোৎপন্না পরা নির্বাণ-নির্বৃতিঃ॥

পঞ্চদশী—৪।৬৪

অর্থাৎ, দৃশ্যবর্গ মিথ্যা, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে নাই—এই বোধের সাহায্যে মন হইতে যাবতীয় দৃশ্য যদি নিরাকৃত হয়, তবেই পরম নির্বাণরূপ নিবৃত্তি উৎপন্ন হয়। ইহাই বিচারজাত সমাধি।

এই বিচার ও তাহার চরম গভীরতারূপ সমাধির অভ্যাসের জন্য কোনও বিশেষ স্থান, কাল বা আসনাদির নিয়ম নাই। স্নানাদির দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাও বড় কথা নয়; শুক্রশোণিতে সৃষ্ট ও মল-মূত্রাদিতে পূর্ণ দেহ কখনও সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ও না। মনকে শুদ্ধ করা অর্থাৎ নামরূপ সত্য—এই প্রকার মিথ্যা বিশ্বাসরূপ অপবিত্রতা হইতে মুক্ত করাটাই উদ্দেশ্য। সাধক শুধু লক্ষ্য রাখিবেন কিসে মন সজাগ থাকিয়া বিচারে নিবিষ্ট হইতে পারে; আর সবই তুচ্ছ। বাহ্য জগৎ এবং নিজ দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্যন্ত সব

কিছুই শুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ, বিচার সহায়ে এ বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয় হওয়াটাই একমাত্র সাধন ; উহা দ্বারাই অভয়, অমৃতত্ব এবং আনন্দস্বরূপতাও লাভ হয়—তাহার জন্য আর পৃথক্ কোনও সাধন নাই। নির্বিকল্প সমাধিতে পর্যবসিত হয় এরূপ নিবিড় বিচার ব্যবহার কালে সম্ভব নয় ; কিন্তু ব্যবহার কালে দৃশ্যদর্শন হইলেও তাহা যে স্বপ্নসম মিথ্যা, তাহা সদা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে "পঞ্চদশী" বলেন :—

স্বস্বপ্নমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা পশ্যন্ স্বজাগরম্।
চিন্তয়েদপ্রমত্তঃ সন্নুভাবনুদিনং মুহুঃ॥ ৭।১৭২
চিরং তয়োঃ সর্ব সাম্যমনুসন্ধায় জাগরে।
সত্যত্ববুদ্ধিং সন্ত্যজ্য নানুরজ্যতি পূর্ববৎ॥ ৭।১৭৩

অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রৎ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ প্রমাদশূন্য হইয়া তদুভয়কে চিন্তা অর্থাৎ তুলনা করিবেন। দীর্ঘদিন এরূপ করিবার ফলে অবশেষে এ দুই অবস্থার সর্বতোভাবে সমতূল্যতা উপলব্ধি করিবেন ও তখন জাগ্রতে সত্যত্ববুদ্ধি ত্যাগ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে আর পূর্বের ন্যায় জাগ্রদ্দৃষ্ট কোনও বিষয়ে অনুরাগ, অর্থাৎ আসক্তি থাকিবে না।

দীর্ঘকাল এরূপ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ও সমাধি অভ্যাসের ফলে তত্ত্ব যখন সম্পূর্ণ আয়ত্ত্ব হইয়া যায়, তখন আর কোনও সাধন বা অভ্যাসের প্রয়োজন থাকে না। তখন তত্ত্বজ্ঞান সদা সর্বদা বিনা প্রয়াসে স্বতঃই স্ফূরিত হইতে থাকে। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন :—

সমাধিনানেন সমস্তবাসনা-
গ্রন্থের্বিনাশোঽখিলকর্মনাশঃ।
অন্তর্বহিঃ সর্বত এব সর্বদা
স্বরূপবিস্ফূর্তিরযত্নতঃ স্যাৎ॥

বিবেকচূড়ামণি—৩৬৩

দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্ বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্।
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্॥

বিবেকচূড়ামণি—৫৩২

অর্থাৎ, এই নির্বিকল্প সমাধির অভ্যাসের ফলে সমস্ত বাসনারূপ গ্রন্থির উচ্ছেদ হয়, সকল কর্মের নাশ হয় এবং সর্বদা, বিনা প্রযত্নেই, অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র আত্মস্বরূপের স্ফূরণ হইতে থাকে। দেবদত্ত নামক কোনও সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে "আমি দেবদত্ত"—এইরূপ বোধ যেমন কোনও যুক্তি-বিচারের অপেক্ষা রাখে না, ব্রহ্মবিদের পক্ষেও সেইরূপ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অনুভবের জন্য কোনও যুক্তি-বিচারের প্রয়োজন হয় না। আচার্য আরও বলিয়াছেন ঃ—

দেহাত্মধীবদ্ ব্রহ্মাত্মধীদার্ঢ্যে কৃতকৃত্যতা।
যদা তদায়ং ম্রিয়তাং মুক্তোঽসৌ নাত্র সংশয়ঃ॥

লঘুবাক্যবৃত্তি—১৮

অর্থাৎ, সাধারণ লোকের যেমন অতি সহজেই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আমিত্ববোধ থাকে—সাধকের যখন তত সহজেই ব্রহ্মেতে আমিত্ব-বোধ উৎপন্ন হয়, তখন তিনি কৃতকৃত্য—অর্থাৎ তাহার পর আর তাঁহার কোনও সাধন করিবার নাই। এর পর তাঁহার দেহপাত হইলেও কোনও ক্ষতি নাই—কারণ তাঁহার যে মুক্তিলাভ হইয়াছে এ বিষয়ে আর কোনও সংশয়ের অবকাশ নাই। আর যদি এর পর তিনি জীবিত থাকেন তবে জীবন্মুক্ত পুরুষরূপেই অবস্থান করেন। আচার্য বলিয়াছেন ঃ—

ততঃ সাধননির্মুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট্।
তৎস্বরূপং ন চৈতস্য বিষয়ো মনসো গিরাম্॥

অপরোক্ষানুভূতি—১২৬

অর্থাৎ, তখন এই যোগীরাজ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং তাহার আর সাধন করিবার কিছু নাই। তাঁহার তখন যে অবস্থা হয় তাহা বাক্য ও মনের অতীত। তখন তাহার মনে হয় :—

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং সর্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥

শঙ্কর—পরাপূজা—১৩

অর্থাৎ, আমি কি করিব, কোথায় যাইব, গ্রহণই বা কি করিব আর ত্যাগ করিবই বা কি? কারণ, যেমন মহাপ্রলয়ে জলের দ্বারা সমস্ত পূর্ণ থাকে, সেইরূপ আমার আত্মা কর্তৃকই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ। এ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর গীতা বলেন :—

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥ ১।২২

অর্থাৎ, যিনি জ্ঞানামৃত পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানযোগীর আর কোনও রূপ যোগানুষ্ঠানাদির প্রয়োজন নাই। তিনি যদি অনুভব করেন যে তাঁহার এখনও কিছু কর্তব্য অবশিষ্ট আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে তিনি ঠিক ঠিক তত্ত্ববিৎ নন। শান্তিগীতা বলেন :—

কর্তব্যং বাপ্যকর্তব্যং নাস্তি তত্ত্ববিদাং সখে।
তেঽকর্তারো ব্রহ্মরূপা নিষেধ-বিধিবর্জিতাঃ॥ ৬।২

অর্থাৎ, (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) :— হে সখে! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের কর্তব্য বা অকর্তব্য বলিয়া কিছু নাই। তাঁহারা বিধি-নিষেধ-বর্জিত, অকর্তা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। অষ্টাবক্রসংহিতা বলেন :—

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্বং ততো বাগ্‌বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ॥ ১২।১

অলং ত্রিবর্গকথয়া যোগস্য কথয়াপ্যলম্।
অলং বিজ্ঞানকথয়া বিশ্রান্তস্য মমাত্মনি॥ ১৯।৮

(জনকের উক্তি)

অর্থাৎ, (জ্ঞান লাভের ফলে), প্রথমে শারীরিক কর্ম অসহ্য হইয়া উঠিল, পরে অধিক বাক্যালাপও অসহ্য হইল ; অবশেষে কোনও রূপ চিন্তাও অসহ্য হইয়াছে। এখন আমি এই ভাবেই আছি অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক বা মানসিক—সকল প্রকার প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া আত্মাতেই শান্তভাবে অবস্থান করিতেছি। আমি এখন পরম বিশ্রান্তিরূপ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত ; সুতরাং আমার পক্ষে এখন আর ধর্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গের কথা, যোগের কথা, এমনকি বিজ্ঞানের কথারও কোনও প্রয়োজন নাই।

যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিং চিন্তয়তি নিশ্চিন্তো দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি॥ ১৮।১৬
নির্বাসনো নিরালম্বঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ।
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুষ্কপর্ণবৎ॥ ১৮।২১
নানাবিচারসুশ্রান্তো ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
ন কল্পতে ন জানাতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি॥ ১৮।২৭
একাগ্রতা নিরোধো বা মূঢ়ৈরভ্যস্যতে ভৃশম্।
ধীরাঃ কৃত্যং ন পশ্যন্তি সুপ্তবৎ স্বপদে স্থিতাঃ॥ ১৮।৩৩
সুখমাস্তে সুখং শেতে সুখমায়াতি যাতি চ।
সুখং বক্তি সুখং ভুঙ্‌ক্তে ব্যবহারেঽপি শান্তধীঃ॥ ১৮।৫৯
শুদ্ধস্ফূরণরূপস্য দৃশ্যভাবমপশ্যতঃ।
ক্ব বিধিঃ ক্ব চ বৈরাগ্যং ক্ব ত্যাগঃ ক্ব শমোঽপি বা॥ ১৮।৭১

(অষ্টাবক্রের উক্তি)

অর্থাৎ, যিনি ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, (কিন্তু আমিই সেই ব্রহ্ম এই অভেদ-জ্ঞানে এখনও সুপ্রতিষ্ঠ হন নাই) তিনি "আমিই ব্রহ্ম"

এইরূপ চিন্তা করিবেন; কিন্তু যিনি নিজের আত্মার অতিরিক্ত কোনও কিছুই দর্শন না করার ফলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তিনি আর কি চিন্তা করিবেন? শুষ্ক পত্র যেরূপ বায়ু-সঞ্চালিত হইয়া বায়ুর গতির অভিমুখে উড়িয়া বেড়ায়, কামনা-বিরহিত, অন্য নিরপেক্ষ স্বাধীন ও বন্ধনহীন জ্ঞানী ব্যক্তি সেইরূপ সংস্কাররূপ বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া সংসারে কর্ম করিয়া থাকেন। নানারূপ তর্কবিচারে ক্লান্ত হইয়া ধীর ব্যক্তি যখন অবশেষে তর্কাতীত, বিশ্রান্তিস্বরূপ আত্মতত্ত্বের সন্ধান পাইয়া শান্তচিত্ত হইয়া যান, তখন আর তিনি কোনও রূপ কল্পনা করেন না, কোনও কিছু জানিতেও চাহেন না, কোনও কিছু শুনিতে বা দেখিতেও চান না। মূঢ় ব্যক্তিই সর্বদা চিত্তবৃত্তির একাগ্রতার বা নিরোধের চেষ্টা করিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী, তিনি করিবার মত কিছুই দেখিতে পান না। তিনি সুষুপ্ত পুরুষের ন্যায় শান্তভাবে স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। শান্তচিত্ত জ্ঞানীপুরুষ ব্যবহারকালে সুখে উপবেশন করেন, সুখে নিদ্রা যান, সুখে আগমন করেন, সুখে গমন করেন, সুখে বাক্যালাপ করেন এবং সুখে ভোজন করেন। শুদ্ধ চিৎস্বরূপ, দৃশ্য-অদর্শনকারী পুরুষের পক্ষে নিয়মই বা কোথায়, বৈরাগ্যই বা কোথায়, ত্যাগই বা কোথায় এবং শমেরই বা প্রয়োজন কোথায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দৃষ্টান্ত দিতেন—"কলসী জল ভরিবার কালে শব্দ করে; জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেলে আর শব্দ করে না।" আবার বলিতেন—"ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজনের সময় খুব কোলাহল; খাওয়া সুরু হইলে শব্দ অনেক কম আর সকলের যখন পেট ভরিয়া যায় তখন আর কোনও শব্দ নাই—তখন নিদ্রা"।

ইহাই জীবন্মুক্তিরূপ মহানন্দের অবস্থা। ইহাতে পৌঁছিবার পরও অবশ্য আধিকারিক বা অবতারপ্রতিম দৃঢ়জ্ঞানী পুরুষগণ লোকশিক্ষা বা অন্যপ্রকার লোকহিতকর কর্ম লইয়াই থাকেন। কিন্তু সাধারণ মুক্ত জীবের বেলায় অন্য রূপ। তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া কিছু থাকে না।

কর্ম করিবার কোনও ইচ্ছা বা বাসনাও তাঁহাদের থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়াই যে একেবারে সকল কর্মই চলিয়া যায় তাহা নয়। নিজ নিজ প্রারব্ধানুসারে অন্য জীবের ন্যায় তাঁহাদিগকেও অল্পাধিক কর্ম করিতেই হয়। যতদিন দেহ থাকে ততদিন আহারাদি কর্ম তো থাকেই—অধিকন্তু জীবিকা উপার্জনের জন্যও কর্ম করিতে হয়—সন্ন্যাসীদের পক্ষে ভিক্ষাদির দ্বারা এবং গৃহীদের পক্ষে নিজ নিজ জীবিকা দ্বারা। জ্ঞানী সব কিছুকেই—কর্মকেও ব্রহ্মরূপে দেখেন; তাই এসকল অনিচ্ছালব্ধ কর্মকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা বা চেষ্টাও তাঁহার থাকে না। জ্ঞানীরা সকলেই মহাপুণ্যবান্, কারণ বহু জন্মের অনন্ত পুণ্যফল ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। তবে সকল জ্ঞানীর প্রারব্ধ সমান নয়; কাহারও কাহারও প্রারব্ধ এরূপ যে অধিক কর্ম করিতে হয় না; সহজেই জীবিকাদির জোগাড় হইয়া যায়। তাঁহারা অধিক কাল সমাহিত থাকিবার অবসর পান ও তৎফলে অধিক সময় আত্মানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে পারেন। যাঁহাদের প্রারব্ধ অন্যরূপ তাঁহাদিগকে অধিকতর কর্ম করিতে হয় এবং তৎ তৎ পরিমাণে সমাধিসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। অবশ্য যদি জ্ঞানের অত্যন্ত দৃঢ়তা থাকে তবে কর্মের মধ্যে থাকিয়াও সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন এবং সর্বদা ব্রহ্মানন্দসুখানুভূতি অব্যাহত থাকিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে Intense tranquility in the midst of intense activity—অর্থাৎ, প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে থাকিয়াও অন্তরে সুগভীর প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা—ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অপরের দৃষ্টিতে দেহের জরা, ব্যাধি প্রভৃতি জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেরই সমান। এমনকি জ্ঞানীর নিজের দৃষ্টিতেও দৈহিক দুঃখের বা মানসিক দুঃখের আদৌ কোনও অনুভব যে হয় না তাহা নয়; জ্ঞানী বরঞ্চ অপর সকল জীবের দুঃখকেও নিজের দুঃখের ন্যায় বোধ করেন। তবে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুঃখের মিথ্যাত্ববোধও জ্ঞানীতে বর্তমান থাকে, যাহা অজ্ঞানীতে থাকে না। ইহাই অজ্ঞানীর দুঃখের সহিত

জ্ঞানীর দুঃখের পার্থক্য। ফলে জ্ঞানীর দুঃখ তত গভীর হয় না; মনের উপরতলে কখনও কখনও দুঃখ উপস্থিত হইলেও অন্তরের গভীরে জ্ঞান-জাত আনন্দ ও প্রশান্তির ধারা ফল্গু নদীর জলধারার ন্যায় সর্বাবস্থাতেই প্রবাহিত থাকে। মহাসমুদ্রে তুফান উঠিলে জলের উপরিভাগ বিক্ষোভিত হয়—কিন্তু গভীর স্তরে জল যেমন প্রশান্ত তেমন প্রশান্তই থাকে। জ্ঞানীর প্রবল কাম ক্রোধাদি থাকে না; উহা থাকিতে জ্ঞানই হয় না। জ্ঞান লাভের জন্য যে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন তাহা অর্জন করিবার সাধনকালেই কাম ক্রোধাদি ক্ষীণ হইয়া যায়। কিন্তু অতি সামান্য কাম ক্রোধাদি জ্ঞানীতেও থাকিতে পারে; তাহা জ্ঞানের বা মুক্তির বাধক হয় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পোড়া দড়ির উপমা দিতেন। পোড়া দড়িতে দড়ির আকারমাত্রই থাকে, তাহা দিয়া বন্ধন করা যায় না। সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কামক্রোধাদির বীজ বা বাসনা দগ্ধ হইয়া যায়; যেটুকু থাকে তাহা কাম-ক্রোধের আকার মাত্র। তাহা বন্ধনের কারণ হয় না। এই কারণে জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বর্ণনায় সমাধিস্থ এবং ব্যবহারপরায়ণ উভয় প্রকার জ্ঞানীর কথাই দেখিতে পাওয়া যায়।

যে জ্ঞানী সমাধিস্থ এবং যে জ্ঞানী ব্যবহারপরায়ণ তাহাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ প্রশ্ন মনে উঠা স্বাভাবিক। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্র এই প্রশ্ন করিতেছেন এবং তদুত্তরে শ্রীবশিষ্ঠদেব বলিতেছেন যে ব্যবহারকালেও যদি অন্তরে শীতলতা বর্তমান থাকে তবে সমাধি ও ব্যবহার সমানই হইল। ব্যবহার-কালেও যাঁহার তত্ত্ব বিস্মরণ হয় না—তাঁহারই জ্ঞান কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়াছে বলা যায়।

ক্বচিন্ মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিন্ ভ্রান্তো সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।

ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সতত পরমানন্দসুখিতঃ॥

—বিবেকচূড়ামণি : ৫৪২

অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কখনও মূঢ়বৎ, কখনও বিদ্বান্, কখনও মহারাজবিভবসম্পন্ন, কখনও ভ্রমণরত, কখনও শান্তমূর্তি, কখনও বা অজগরবৃত্তিসম্পন্ন, কখনও সম্মানিত, কখনও অবমানিত, কখনও বা অন্যের অবিদিতরূপে বর্তমান থাকিয়া সর্বদা পরমানন্দ সুখে কালাতিপাত করেন।

যাহা হউক, ক্রমশঃ প্রারব্ধ ক্ষয়ের সহিত জ্ঞানীর কর্মও কমিতে থাকে, এবং তৎ তৎ পরিমাণে জ্ঞানের ফলও ফলিতে থাকে। তখন তিনি গভীর হইতে গভীরতর সমাধিতে মগ্ন হইতে থাকেন। আহারবিহারাদি কর্ম যতদিন যতটুকু থাকে, তাহা অপর সাধারণ—অর্থাৎ প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিতেই থাকে। তাঁহার নিজের পক্ষে উহা ক্রমশঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে, নিজের কোনও রূপ সঙ্কল্প ছাড়াই, কেবল ঈশ্বরেচ্ছাতেই সম্পাদিত হয়। তাঁহার নিজের নিকট সকল বিষয়ে, সকল কর্মে, সকল অনুভবে, ক্রমে শুধু চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম দর্শনই হইতে থাকে। এই গভীর সমদর্শনের ফলে ক্রমে ক্রমে সকল কর্মই বন্ধ হইতে থাকে এবং অবশেষে ব্রহ্মস্বরূপ তিনি দেহান্তে ব্রহ্মে লীন হইয়া যান এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। প্রথম জ্ঞানোদয় হইতে বিদেহমুক্তি পর্যন্ত এই যে অবস্থার ক্রমপরিণতি—তাহা আমরা যেরূপ সংক্ষেপে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলাম—তত শীঘ্র বা তত সহজে হয় না। অবস্থার এই ক্রমবিকাশকে যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বাহুল্যবোধে আমরা তাহার সবিস্তার উল্লেখ হইতে বিরত হইলাম। জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বর্ণনায় বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন জ্ঞানীর বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অবতার ও আধিকারিক জাতীয় পুরুষদিগের শক্তি অপরিসীম ; তাই তাঁহারা সর্বদা ও সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়াও লোকশিক্ষার জন্য ব্যবহারপরায়ণ হইবার ক্ষমতা ধারণ করেন। লোকব্যবহার করিয়াও তাঁহারা মায়ার দ্বারা অভিভূত হন না। সাধারণ সাধকের সে শক্তি নাই ; তাই তিনি যেন অবতার বা আধিকারিক পুরুষগণের বৃথা অনুকরণে ইচ্ছাপূর্বক নানাবিধ কর্মজাল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিজকে আবদ্ধ করিয়া ও তৎফলে বিচারে অবহেলা করিয়া নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন না। অপরপক্ষে, সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্বেই যেন নিজ নিজ অবস্থানুরূপ নিষ্কাম কর্ম, উপাসনা বা বিচাররূপ সাধন জোর করিয়া ত্যাগ করিয়া বসিবেন না। মতলব করিয়া কর্ম ত্যাগ অজ্ঞানেরই লক্ষণ। তাঁহারা একদিকে যেমন ইচ্ছা করিয়া কর্ম সৃষ্টি করিবেন না—অপর দিকে তেমনি প্রারব্ধবশে, ঈশ্বরেচ্ছায় প্রেরিত কর্ম বর্জন করিবার চেষ্টাও করিবেন না। তাঁহাদের মনোভাব হইবে :—

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্য দুর্গ্রহঃ।
যদা যৎ কর্তুমায়াতি তৎ কৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা : ১৮।২০

অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তির কর্মের প্রতি বা কর্ম বর্জনের প্রতি—কোনও দিকেই কোনও প্রবল ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকে না। (ঈশ্বর ইচ্ছায়) যখন যে কর্তব্য (আপনা হইতেই) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়—তাহা সম্পাদন করিয়া তিনি সুখে অবস্থান করেন। তাঁহার যদি কোনও চেষ্টা থাকে তবে তাহা হইবে শুধু যাহাতে জ্ঞানের দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানের দৃঢ়তার বৃদ্ধির সহিত উপরতির বৃদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে যে যে অবস্থা হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সাধকের জ্ঞান হইল কি না—এবং হইয়া থাকিলেও তাহা দৃঢ় ও প্রতিবন্ধশূন্য হইল কি না—অর্থাৎ তাহার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে

কি না—তাহা তাঁহার আহার-বিহারাদি লোকব্যবহার দেখিয়া অন্যেরা সব সময় ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে না ; কিন্তু আন্তরিক হইলে তিনি নিজে তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। আচার্যেরা দৃঢ় জ্ঞানী, দৃঢ় ভক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত পুরুষের অনেক লক্ষণের বিবরণ দিয়াছেন। এগুলি সাধক নিজের অন্তরে নিজেই বুঝিতে পারেন—তাই এ সকলকে স্বসংবেদ্য লক্ষণ বলা হয়। যতদিন না সাধক এগুলির সহিত নিজের অবস্থা মিলাইয়া দেখিয়া নিজের সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে পারেন—ততদিন তাঁহাকে বিচার ও সমাধির অভ্যাসে লাগিয়া থাকিতে হইবে। এ সকল লক্ষণের কিছু বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে ; আরও কিছু বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইবে। এখানে আচার্যের একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করা হইল :—

সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতজ্জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ।
বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি ॥

—বিবেকচূড়ামণি : ৪১৮

অর্থাৎ, সাধক জ্ঞানযোগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সিদ্ধিলাভ করেন ও জীবন্মুক্ত হন। তাহার ফলে তিনি সদা সর্বদা অন্তরে বাহিরে আত্মানন্দরস আস্বাদন করিতে থাকেন ; অর্থাৎ তিনি সর্বদা আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া এই কথাই অনেকের সর্বপ্রথম মনে হইয়াছে, যে "এমন আনন্দময় পুরুষ আর দেখি নাই।" যখন হাসিতেন তখন তাঁহার চোখে, মুখে, এমনকি সর্বাঙ্গে যেন একটা আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইত। তিনি সর্বদা নিজেও ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন এবং অপর সকলকেও সেই আনন্দের ভাগী করিবার জন্য তাঁহার অন্তর সর্বদাই ব্যাকুল ছিল।

এবারে আর দুই একটি বিষয়ে কিছু মন্তব্য করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

মনন

পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি উঠিতে পারে তাহার বিচার করিয়া অদ্বৈততত্ত্বই যে প্রকৃত সত্য এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার চেষ্টাকে মনন বলে এবং ইহা বেদান্ত বিচারের অঙ্গীভূত একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আচার্যেরা যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা এই যে মনন বলিতে শুধু তর্ক বা কুতর্ক বুঝায় না। শ্রদ্ধাসহ শ্রুতি ও বেদান্তাচার্যদিগের প্রদর্শিত পথে বিচার করিয়া তাহাকে ফলীভূত করিবার জন্য বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি ও সমাধির অভ্যাস দ্বারা অনুভূতির দিকে অগ্রসর হওয়াকেই প্রকৃত মনন বলা যায়; কারণ অনুভূতির দ্বারাই শেষ পর্যন্ত সকল সন্দেহের নিরসন হয়। নতুবা নিজের খেয়ালখুসিমত অনাত্মজ্ঞ লোকের সহিত আজীবন তর্ক বিতর্ক করিয়াও সাধক কোনও নিশ্চিত তত্ত্বে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না এবং প্রকৃত সুখ ও শান্তিও লাভ করিতে পারিবেন না। অধিক শাস্ত্রপাঠেও বিশেষ কিছু লাভ হয় না, যদি না আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। তাই আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন ঃ—

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা॥ ৫৯
শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাজ্ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎ তত্ত্বমাত্মনঃ॥ ৬০

—বিবেকচূড়ামণি

অর্থাৎ, আত্মস্বরূপ যদি অবিজ্ঞাত—অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া গেল, তবে শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল; আর আত্মস্বরূপ যদি বিজ্ঞাত হয় তাহা হইলেও শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল, অর্থাৎ তখন শাস্ত্রাধ্যয়নের আর প্রয়োজন থাকে না। বিভিন্ন শাস্ত্রসমূহ গভীর অরণ্যের ন্যায় পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। অতএব সাধক তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির নিকট

হইতে যত্নসহকারে আত্মতত্ত্ব কি তাহাই জানিবার চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রুতিও বলেন ঃ—

তমেবৈকং জানথ আত্মান-
মন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ ঃ ২।২।৫, শেষার্ধ

অর্থাৎ, সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও ; এবং অনন্তর অপর সকল বাক্য বর্জন কর। এই আত্মতত্ত্বই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়।

তমের ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥ ইতি॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ঃ ৪।৪।২১

অর্থাৎ, ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সাধক (শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট হইতে) আত্মার বিষয় জানিয়া প্রজ্ঞা অবলম্বন করিবেন (অর্থাৎ, তাহা অপরোক্ষ করিবার চেষ্টাই করিবেন)। তিনি যেন বহু শব্দের চিন্তা করিবেন না, কারণ উহা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর।

এ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি উপাখ্যান আছে। স্বয়ং নারদ চারিটি বেদ ও অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র পাঠ করিয়াও আত্ম-সাক্ষাৎকারের অভাবে শোক অতিক্রম করিতে পারেন নাই—অর্থাৎ, দুঃখাতীত হইয়া শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ভগবান সনৎকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তবে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

এ যুগেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রের মর্মকথা সাধুগণের মুখে শ্রবণ করিয়া এবং নিজ সাধনবলে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও তাঁহার সহিত বিচারে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আবার তখন শুধু শাস্ত্রপাঠের বিফলতা সম্যক্ উপলব্ধি

করিয়াছিলেন ; বুঝিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রে যে ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র পাঠ করা সত্ত্বেও অনুভূতির অভাবে নিজ হৃদয় মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক ও আনন্দবিহীন, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায় নিরক্ষর হইয়াও সেই ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করিয়া সর্বদাই আনন্দসাগরে নিমগ্ন। পরে অশ্রুসিক্ত বক্ষে পরমহংসদেবের নিকট হইতে আশীর্বাদ ভিক্ষা লইয়া ব্রহ্মানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ চিরতরে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন।

মহর্ষি রমণের জীবনকাহিনীও প্রায় এইরূপ।

তবে যে অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রের মধ্যে অনেক জটিল গ্রন্থ দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে মধ্যবর্তী যুগে এক সময় অনেক বিরুদ্ধ-বাদী পণ্ডিত অদ্বৈতবাদের বিপক্ষে অনেক কূটতর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে এ সকল কূটতর্ক পূর্ণ বৈরাগ্যের অভাব বা চিত্তশুদ্ধির অসম্পূর্ণতা হইতেই অজ্ঞাতসারে উদ্ভূত, তথাপি এ সকল যাহাতে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া না যায়, এই জন্যই ঈশ্বরেচ্ছায়, লোককল্যাণ সাধনার্থ কোনও কোনও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতদের তর্কক্ষেত্রেই অবতরণ করিয়া এই সকল যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। নতুবা, নিজের তত্ত্বোপলব্ধির জন্য এত সব বাক্‌বিতণ্ডার কোনও প্রয়োজন নাই। পরমহংসদেব বলিতেন, লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেই ঢাল তলোয়ার ইত্যাদির প্রয়োজন হয় ; নতুবা শুধু আত্মহত্যার জন্য একটি নরুণই যথেষ্ট।

জ্ঞান ও যোগ

আমরা দেখিয়াছি যে বিচারের ফলে দৃশ্যবর্গের মিথ্যাত্ব সুনিশ্চিত হইলে মন স্বতঃই নির্বিষয় হইয়া গিয়া একমাত্র সত্য বস্তু যে আত্মা তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। বিচারপথে অর্থাৎ, জ্ঞানযোগে ইহাকেই নির্বিকল্প সমাধি বলা যায়। এই প্রকার নির্বিকল্প সমাধিই শ্রেষ্ঠ এবং

ইহাই মোক্ষপ্রদ। কিন্তু এই বেদান্তবিচার বা জ্ঞানযোগ অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভব হয় না। চিত্তের চঞ্চলতা দূর করিবার জন্য তাহাদিগের পক্ষে যোগাভ্যাসই বিধেয়। পরে, চিত্ত অনেকাংশে শান্ত হইলে, বেদান্ত বিচার প্রশস্ত। এ বিষয়ে পঞ্চদশী গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ—

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধীর্ন হি।
যোগো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥ ৯।১৩২
অব্যাকুলধিয়াং মোহমাত্রেণাচ্ছাদিতাত্মনাম্।
সাংখ্যনামা বিচারঃ স্যান্ মুখ্যো ঝটিতি সিদ্ধিদঃ॥ ৯।১৩৩

অর্থাৎ, নানা বিষয় চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিচারপথে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। তাহাদের পক্ষে যোগাভ্যাসই মুখ্য সাধন, কারণ উহা দ্বারা চিত্তের চঞ্চলতা দূর হয়। আর যাহাদের চিত্ত ব্যাকুল নহে, কেবল মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহাদিগের পক্ষে তত্ত্ববিচারই শ্রেষ্ঠ সাধন ; কারণ উহা দ্বারাই সত্বর মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যোগ বলিতে মুখ্যতঃ অষ্টাঙ্গ যোগই বুঝায় ; ঈশ্বরোপাসনাও তাহার অন্তর্গত।

বিচারকালে চিত্তের যে একাগ্রতার প্রয়োজন হয় তাহাও যোগ। এমন কি মধ্যম অধিকারী ব্যক্তি বিচারাদি সহায়ে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার পরও উহা প্রতিবন্ধশূন্য করিবার জন্য তাঁহাকে যে নিদিধ্যাসন ও নির্বিকল্প সমাধির অভ্যাস করিতে হয়, তাহাতেও জ্ঞানসহ যোগও বিদ্যমান ; কারণ উহাও সাধকের ইচ্ছা ও প্রযত্ন-সাপেক্ষ। শুদ্ধজ্ঞান শুধু তাহাকেই বলা যায় যেখানে অন্তরে ও বাহিরে চিদানন্দস্বরূপ আত্মার স্ফূরণ কোনও প্রকার প্রযত্ন বিনাই হইতে থাকে। এ অবস্থা লাভের পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞান ও যোগের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। এমনকি এমতাবস্থাপন্ন জ্ঞানীকেও শাস্ত্রে অনেক স্থলে যোগীও বলা হইয়াছে।

জ্ঞান ও ভক্তি

জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠাবশতঃ, প্রথমাবস্থায়, কোনও কোনও জ্ঞানাভ্যাসীর মনে ভক্তির প্রতি কিঞ্চিৎ উপেক্ষা বা ঔদাসীন্যের ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান পরিপক্ক হইলে প্রকৃত জ্ঞানী পরে বুঝিতে পারেন যে বিচারপথে লব্ধ যে অপরোক্ষানুভূতি তাহা ভক্তিরই প্রকৃষ্ট রূপ। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার প্রতি জীবের আকর্ষণ—অর্থাৎ প্রেম বা ভক্তি থাকিবেই। কিন্তু অজ্ঞ জীবের অন্য বস্তুতেও প্রীতি থাকিতে পারে এবং নিজ আত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক্ এইরূপ ধারণা থাকায় তাঁহার প্রীতিও জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে বিভক্ত হয়। এজন্য তাঁহার প্রেম, প্রীতি বা ভক্তি শুধু ঈশ্বরে প্রবাহিত হইতে পারে না। জ্ঞানীর এ সকল প্রতিবন্ধ নাই; তাঁহার নিকট জগতের বা জীবাত্মার কোনও পৃথক্ অস্তিত্বই নাই; সবেতেই তিনি শুধু আনন্দঘন পরমাত্মাকেই অনুভব করেন; সুতরাং তাঁহার ভক্তি অবিভক্ত ধারায় শুধু ঈশ্বরের প্রতিই প্রবাহিত হয়। তাই, জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। শ্রুতি বলেন, জ্ঞানী "আত্মক্রীড়, আত্মরতি ও আত্ম-মিথুন" হন (ছা : ৭।২৫।২)। এ সকল শব্দ দ্বারা জ্ঞানীকে ভক্তই বলা হইল। গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।" (৭।১৭, প্রথমার্ধ) অর্থাৎ, ভক্তদিগের মধ্যে নিত্যযুক্ত ও একভক্তি বলিয়া জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। জ্ঞানী সর্বদা ও সর্বত্র শুধু ব্রহ্মকেই দর্শন করেন—সুতরাং শুধু তাঁহারই পক্ষে "নিত্যযুক্ত" এবং "একভক্তি" হওয়া সম্ভব।

অপর পক্ষে যিনি আন্তরিক ঈশ্বর ভক্ত, তাঁহার পক্ষে বেদান্তবিচার এবং আত্মানুভূতি সহজলভ্য হয়। আচার্য শঙ্কর তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

পরিপক্কং মনো যেষাং কেবলোঽয়ং চ সিদ্ধিদঃ।
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্বেষাং সুলভো জবাৎ॥ ১৪৪

অর্থাৎ, যাঁহাদের চিত্ত অতিশয় নির্মল তাঁহাদের পক্ষে কেবল ইহার দ্বারাই (গ্রন্থোক্ত বেদান্তবিচার দ্বারাই) সম্যক্ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি গুরু ও ঈশ্বরে একনিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে অতি সুলভ। এ বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন :—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

অর্থাৎ, যাঁহারা নিত্যযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ, বাহ্য বিষয়ে সর্বতোভাবে কামনাশূন্য হইয়া পরম প্রীতিসহকারে আমাকে, অর্থাৎ সর্বাত্মক ঈশ্বরকে ভজনা করেন, তাহাদিগকে আমি তত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করি। সেই সম্যক্ জ্ঞানের ফলে তাঁহারা আমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন। সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই আমি তাঁহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া তত্ত্বজ্ঞানজনিত উজ্জ্বল বিবেকরূপ প্রদীপ দ্বারা তাঁহাদের অবিবেক-জনিত মিথ্যাজ্ঞানরূপ মোহান্ধকার বিনাশ করিয়া থাকি। ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মত্বলাভের কথা ভগবান্ ১৪।২৬, ১৮।৫৫ প্রভৃতি অন্যান্য বহু শ্লোকেও বলিয়াছেন। এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রুতি বলেন :—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ৬।২৩

অর্থাৎ, যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি পরা ভক্তি আছে এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ ভক্তি, গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই

মহাত্মার নিকটই উপনিষদে বিবৃত তত্ত্বসকল স্বানুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

সুতরাং জ্ঞানীর নিকট ভক্তি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তিতে; প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত ভক্তে; এবং নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে কোনও প্রকৃত ভেদ নাই। তাই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণের মধ্যে অনেকেই ব্যবহার-কালে, অনেক সময় ভক্তি ও ভক্ত লইয়াই থাকেন এবং ঈশ্বরই সব কিছু হইয়াছেন এবং সকল প্রাণীর মধ্য দিয়া—তাঁহার নিজেরও মধ্য দিয়া ঈশ্বরই সব কিছু করিতেছেন, তিনি নিজে কোনও কিছুরই কর্তা নন, ইহা জানিয়া সকল ব্যাপারে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এবং সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ লইয়া জীবন যাপন করেন। দেবর্ষি নারদ, আচার্য শঙ্কর, আচার্য মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতির জীবন ইহার উদাহরণ স্থল।

ভক্তিতে দ্বৈত আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু জ্ঞানেও কি দ্বৈত নাই? জ্ঞান অদ্বৈতে পৌঁছাইয়া দেয় মাত্র; জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, তাহাই শুধু সম্পূর্ণরূপে দ্বৈত-বিবর্জিত। জীবন্মুক্ত পুরুষেরও দ্বৈত-দর্শন হয়; সুতরাং তাঁহাতেও কিঞ্চিৎ অবিদ্যালেশ স্বীকার করিতে হইবে বই কি? তবে বিশেষ এই যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দ্বৈতে অন্যের ন্যায় সত্যত্ববুদ্ধি নাই, তাই তিনি বদ্ধ নন এবং জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহার অবিদ্যালেশও দ্রুত ক্ষীয়মান। এইরূপে অবিদ্যার সম্পূর্ণ বিনাশে তিনি পরিশেষে আর দ্বৈত-দর্শনই করেন না, কিন্তু এ অবস্থা-লাভের পর দেহ আর অধিককাল থাকে না। ইহা বিদেহমুক্তির অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা।

অদ্বৈতবেদান্তের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য এই যে, এই পথে মুক্তি লাভের জন্য পরলোকে গমনের অপেক্ষা নাই, কারণ এই মতে দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—যাহারা জীবকে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ বন্ধন করিয়া রাখে, তাহাদের পারমার্থিক সত্যতা নাই, তাহাদের অস্তিত্ব অজ্ঞানকল্পিত। সুতরাং, ইহলোকেই, প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল বন্ধন ছিন্ন হয় এবং জীব মুক্ত হইয়া যায়। ইহাকে জীবন্মুক্তি বলা হয় এবং এই জীবন্মুক্তি লাভই এই সাধন পথের লক্ষ্য। সুতরাং এই অধ্যায়ে উক্ত অবস্থার বিবরণ, যাহা বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাহার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এই একই অবস্থাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "স্থিতপ্রজ্ঞ", দ্বাদশ অধ্যায়ে "ভক্ত" এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে "গুণাতীত" বলা হইয়াছে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ঃ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২

অর্থাৎ, যোগী যখন সমস্ত মনোগত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং বাহ্যনিরপেক্ষ হইয়া আত্মানন্দেই তৃপ্ত থাকেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। দুঃখে উদ্বেগবিহীন, সুখে নিস্পৃহ এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত মুনিকে স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। যিনি সকল বিষয়ে স্নেহ, অর্থাৎ আসক্তিশূন্য, যিনি শুভ প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না বা অশুভ প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না তাঁহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান স্থিত, অর্থাৎ দৃঢ় হইয়াছে বলা যায়। কূর্ম যেমন মস্তক পদাদি অঙ্গসকল সঙ্কোচ করিয়া লয়, সেইরূপ, মহাত্মা পুরুষ যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করেন, তখন তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিষয়গ্রহণে অসমর্থ আতুর ব্যক্তির বা বিষয়ভোগ পরাঙ্মুখ অজ্ঞান তপস্বী ব্যক্তির শব্দাদি বিষয়-গ্রহণ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তৎতদ্‌বিষয়ে বাসনার নিবৃত্তি হয় না। পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে সেই বাসনারও নিবৃত্তি হয়। সর্বভূতের নিকট যাহা রাত্রি-স্বরূপ, অর্থাৎ অজ্ঞাত, সেই আত্মসাক্ষাৎকারে সংযমী পুরুষ, অর্থাৎ, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সর্বদাই জাগ্রত থাকেন। আর যে অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে ভূতগণ জাগ্রত থাকে, অর্থাৎ জগৎ দর্শন করে, স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট তাহা রাত্রিস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি সংসার দর্শন করেন না। অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জগৎ দর্শন করেন, ব্রহ্ম দর্শন করেন না; আর স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী সর্বত্র শুধু ব্রহ্মই দর্শন করেন, জগৎ দর্শন করেন না। যিনি সমস্ত বাসনা নিঃশেষে পরিত্যাগপূর্বক নিস্পৃহ, নির্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি।

ইহা লাভ করিলে আর সাধক মোহগ্রস্ত হন না। অন্তিম সময়েও যিনি এই অবস্থা লাভ করেন তিনি ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। (আর যিনি তৎপূর্বেই এ অবস্থা লাভ করেন, তাহার তো কথাই নাই।)

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবানের প্রিয় ভক্তের লক্ষণ

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

অর্থাৎ, (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন ও করুণাপরবশ ; যাঁহার কোনও বস্তুতে মমত্ববুদ্ধি ও দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নাই ; যিনি সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে ক্ষুব্ধ না হইয়া অবিচল থাকেন ; যিনি ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযত স্বভাব ও তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ; যাঁহার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে সমর্পিত, এরূপ মদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যাঁহার ব্যবহারে অপর কোনও ব্যক্তি উদ্বেগগ্রস্ত হয় না ও যিনি

অন্যের কোনও ব্যবহারেই উদ্বিগ্ন হন না ; যিনি হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ভয়হীন এবং যিনি সকল প্রকার সকাম কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি (প্রিয় বস্তু লাভে) হৃষ্ট হন না, (অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে) দ্বেষ করেন না এবং যিনি শুভ ও অশুভ উভয় প্রকার কর্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে যাঁহার সমদৃষ্টি, যিনি সম্মান ও অপমানকে সমান জ্ঞান করেন, শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে যাঁহার সমবুদ্ধি, যিনি আসক্তিবিহীন, নিন্দা ও স্তুতি এতদুভয়ই যাঁহার নিকট সমান, যিনি সংযতবাক্, যিনি শরীর-রক্ষা বিষয়ে অনায়াসে যৎকিঞ্চিৎ লাভেই সন্তুষ্ট, যিনি নির্দিষ্ট বাসস্থানবিহীন এবং পরমাত্মাতে স্থিরবুদ্ধি—এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়।

এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে এ সকল শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্তের যে সকল চিহ্নের বিবরণ দিয়াছেন, সে সকল অর্জন করিতে হইলে সকল প্রকার ভেদজ্ঞানের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। সর্বদা, সর্বত্র একমাত্র ব্রহ্ম দর্শনের ফলেই তাহা সম্ভব। অর্থাৎ, দৃঢ়জ্ঞানীর পক্ষেই ভগবানের প্রিয় ভক্ত হওয়া সম্ভব। "অভেদ-দর্শনং জ্ঞানম্" —অর্থাৎ জ্ঞান বলিতে অভেদ-দর্শনই বুঝায়।

গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডবঃ।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচতে ॥ ২৫

অর্থাৎ, (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) হে পাণ্ডব! (সত্ত্বগুণের কার্য) প্রকাশ, (রজোগুণের কার্য) প্রবৃত্তি ও (তমোগুণের কার্য) মোহ স্বয়ং আবির্ভূত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না ও তাহাদের নিবৃত্তি হইলে পুনরুদয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি জগৎ দর্শন করিয়াও তাহা অজ্ঞানের গুণত্রয়েরই কার্যমাত্র—এইরূপ জানিয়া নিজকে তাহাতে লিপ্ত না করিয়া কূটস্থ জ্ঞানেই অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন; যাঁহার সুখ ও দুঃখে সমবুদ্ধি; যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত; মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার সমবুদ্ধি; যে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি, মান ও অপমান, শত্রু ও মিত্র সমান বোধ হয় ও যিনি ইহলোকে বা পরলোকে ফল লাভার্থ যে নানা প্রকার সকাম কর্ম করা হইয়া থাকে সে সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দেহ ধারণোপযোগী কর্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।

দ্রষ্টব্য ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে "স্থিতপ্রজ্ঞের," দ্বাদশ অধ্যায়ে "ভক্তের" ও চতুর্দশ অধ্যায়ে "গুণাতীতের" যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে—তাহা সর্বত্র অভেদ দর্শনরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আচার্য শঙ্কর বিরচিত "বিবেকচূড়ামণি" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত জীবন্মুক্তের অথবা স্থিতপ্রজ্ঞের কয়েকটি লক্ষণ ঃ—

ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী।
নির্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে।
সুস্থিতা সা ভবেদ্ যস্য স্থিতপ্রজ্ঞঃ স উচ্যতে ॥ ৪২৭
যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ঈষ্যতে ॥ ৪২৮

লীনধীরপি জাগর্তি যো জাগ্রদ্ধর্মবর্জিতঃ।
বোধো নির্বাসনো যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪২৯

শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৩০

বর্তমানেঽপি দেহেঽস্মিন্ ছায়াবদনুবর্তিনী।
অহংতামমতাভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩১

অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।
ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তে জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩২

গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৩

ইষ্টানিষ্টসম্প্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৪

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ।
অন্তর্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৫

দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্তব্যে মমাহংভাববর্জিতঃ।
ঔদাসীন্যেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৬

বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্বলাৎ।
ভববন্ধবিনির্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৭

দেহেন্দ্রিয়েষহং ভাব ইদংভাবস্তদন্যকে।
যস্য ন ভবতঃ ক্বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৪৩৮

ন প্রত্যগ্ব্রহ্মণোর্ভেদঃ কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৯

সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জনৈঃ।
সমভাবো ভবেদ্ যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৪০

ন খিদ্যতে নো বিষয়ৈঃ প্রমোদতে
ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ।
স্বস্মিন্ সদা ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং
নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ॥ ৫৩৬

অর্থাৎ, (ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা) শোধিত তৎ ও ত্বং পদার্থের—অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মার একত্বানুভবকারিণী, সংশয়াদিশূন্যা এবং চিদেকনিষ্ঠা যে চিত্তের বৃত্তি তাহাকে প্রজ্ঞা বলা হয়। এই প্রজ্ঞা যাঁহাতে সর্বদা বিনা চেষ্টায় বর্তমান থাকে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যাঁহার প্রজ্ঞা (অর্থাৎ, নিজ আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান) স্থিতা, অর্থাৎ দৃঢ়া হইয়াছে, যিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিতেছেন ও বাহ্যজগৎ যিনি প্রায় বিস্মৃত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মাকারাবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া যিনি জাগ্রত থাকেন, অথচ জাগ্রদাবস্থায় যে বিষয়াকারা বৃত্তি বা বিষয়চিন্তা সাধারণ জীবের হইয়া থাকে তাহা যাঁহার নাই, যাঁহার জ্ঞান বাসনামুক্ত, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। সংসারচিন্তা যাঁহার নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি দেহবান্ হইয়াও যেন দেহহীন—অর্থাৎ যাঁহার দেহাত্মবোধ অতি ক্ষীণ, যাঁহার চিত্ত জীবন-মরণ-সুখ-দুঃখাদি চিন্তাশূন্য তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। দেহ বর্তমান থাকিলেও যাঁহার নিকট তাহা ছায়ার মত মনে হয় এবং তাহাতে যাঁহার "আমি-আমার" ভাব নাই তিনি জীবন্মুক্ত লক্ষণসম্পন্ন। অতীত জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ না করা, ভবিষ্যতে কি হইবে সে বিষয়ে দুশ্চিন্তা না করা এবং বর্তমানে প্রাপ্ত বিষয়ে উদাসীন ভাব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ। স্বভাবতঃই পরস্পর হইতে ভিন্ন এবং গুণ ও দোষবিশিষ্ট যে জাগতিক বিষয়-সকল, তাহাতে সমদর্শন জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ। সর্বত্র সমদর্শিতাবশতঃ, ইষ্টপ্রাপ্তিই হউক অথবা অনিষ্টপ্রাপ্তিই হউক, উভয়ক্ষেত্রেই অবিকার থাকা জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ। চিত্ত ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদনে নিমগ্ন থাকার ফলে আন্তর বা বাহ্য অন্য

কোনও বিষয়ের জ্ঞানের অভাব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে এবং কর্তব্য কর্মে যাঁহার "আমি ও আমার" ভাব নাই এবং যিনি অনাসক্ত ভাবে অবস্থান করেন তিনিই জীবন্মুক্ত। শ্রুতি-প্রমাণ সহায়ে নিজের ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি করিয়া যিনি সকল প্রকার সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে "আমি"-বুদ্ধি ও তদতিরিক্ত অন্য বস্তুতে "ইহা"—এইরূপ বুদ্ধি যাঁহার কখনও উদয় হয় না তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ফলে যিনি নিজ আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কোনও ভেদ দর্শন করেন না, তিনি জীবন্মুক্ত। সাধু ব্যক্তিগণ কর্তৃক পূজিত বা দুষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রপীড়িত হইলে যাঁহার চিত্তে উভয়ক্ষেত্রে সমানভাবের উদয় হয়, তিনি জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত পুরুষ অপ্রিয় বিষয়প্রাপ্তিতে খিন্ন হন না; প্রিয় বিষয়-প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হন না; কোনও বিষয়ে আসক্ত হন না, কোনও বিষয়ে বিরক্তও হন না। তিনি সদা-সর্বদা আত্মানন্দে তৃপ্ত থাকিয়া আত্মাতেই ক্রীড়া করেন এবং আত্মা হইতেই যাবতীয় আনন্দ পাইয়া থাকেন।

অষ্টাবক্র-সংহিতা হইতে ঃ—

অন্তস্ত্যক্তকষায়স্য নির্দ্বন্দ্বস্য নিরাশিষঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো ভোগো ন দুঃখায় ন তুষ্টয়ে॥ ৩।১৪
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা।
কস্যাপ্যুদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা ন হি॥ ১৭।৬
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গৃহ্ণন্ বদন্ ব্রজন্।
ইহিতানীহিতৈর্মুক্তো মুক্ত এব মহাশয়ঃ॥ ১৭।১২
সুখে দুঃখে নরে নার্যাং সম্পৎসু চ বিপৎসু চ।
বিশেষো নৈব ধীরস্য সর্বত্র সমদর্শিনঃ॥ ১৭।১৫

ন মুক্তো বিষয়দ্বেষ্টা ন বা বিষয়লোলুপঃ।
অসংসক্তমনা নিত্যং প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাশ্নুতে॥ ১৭।১৭
নির্মমো নিরহঙ্কারো ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিতসর্বাশঃ কুর্বন্নপি করোতি ন॥ ১৭।১৯
বিলসন্তি মহাভোগৈর্বিশন্তি গিরিগহ্বরান্।
নিরস্তকল্পনা ধীরা অবদ্ধা মুক্তবুদ্ধয়ঃ॥ ১৮।৫৩
সন্তুষ্টোঽপি ন সন্তুষ্টঃ খিন্নোঽপি ন চ খিদ্যতে।
তস্যাশ্চর্যদশাং তাং তাং তাদৃশা এব জানতে॥ ১৮।৫৬
নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী॥ ১৮।৬১
বিক্ষেপেঽপি ন বিক্ষিপ্তঃ সমাধৌ ন সমাধিমান্।
জাড্যেঽপি ন জড়ো ধন্যঃ পাণ্ডিত্যেঽপি ন পণ্ডিতঃ॥ ১৮।৯৭
ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথা তথা যত্র তত্র সম এবাবতিষ্ঠতে॥ ১৮।১০০

অর্থাৎ, (জ্ঞানোদয়ের ফলে) যিনি মন হইতে বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন ; যাঁহার নিকট হইতে সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ, শত্রু-মিত্র ইত্যাদি যাবতীয় ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে ; যাঁহার আশা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছে ; তাঁহার নিকট অপ্রার্থিতরূপে আগত ভোগ দুঃখের বা তুষ্টির কারণ হয় না। এমন মহাপুরুষ নিতান্তই দুর্লভ, যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীবন বা মৃত্যু—কোনও কিছুকে হেয়জ্ঞানও করেন না; আবার উপাদেয়জ্ঞানে তাহা লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতও হন না। সকল কিছুতেই তাঁহার সমবুদ্ধি। যে মহাপুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আস্বাদন, ভোজন, গ্রহণ, কথন, ভ্রমণ—সব কিছুই করেন, কিন্তু কোনও কিছুতেই যাঁহার চেষ্টা করিবার বা চেষ্টা বর্জন করিবার কোনও ইচ্ছা নাই, তাঁহাকেই মুক্ত বলা হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সুখ-দুঃখ, নর-নারী, সম্পদ্-বিপদ্ ইত্যাদি, কোনও কিছুতেই ভেদ-জ্ঞান নাই ; সর্বত্রই তাঁহার সমদৃষ্টি। জীবন্মুক্ত পুরুষের বিষয়ের

প্রতি কোনও দ্বেষও নাই, কোনও লোভও নাই। তিনি সর্বদা অনাসক্তচিত্ত থাকিয়া স্বাভাবিক ভাবে আগত ভোগসকল ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহার "আমি", "আমার" বোধ দূর হইয়াছে, দৃশ্যবর্গের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইয়াছে এবং তাহার ফলে যাঁহার অন্তর হইতে সর্বপ্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইয়াছে, তিনি কর্ম করিয়াও করেন না—অর্থাৎ, কর্ম করিয়াও তাহাতে বদ্ধ না হইয়া মুক্তি সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। মহাভোগের মধ্যে বিলাসই করুন বা গিরিকন্দরেই অবস্থান করুন, বিষয়-কল্পনা নিরস্ত হওয়ার ফলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কোনও অবস্থাতেই আবদ্ধ হন না; তাঁহাদের মন সকল অবস্থাতেই নির্লিপ্ত থাকে। বাহ্য দৃষ্টিতে জ্ঞানী ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট বা খিন্ন হইতে দেখা গেলেও তাঁহার অন্তরের গভীরে সন্তোষ বা খেদ কোনও বিকারই উপস্থিত হয় না। তাঁহার এই আশ্চর্য অবস্থা শুধু তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন (সাধারণ লোকে পারে না)। অজ্ঞ ব্যক্তি বাহ্য দৃষ্টিতে নিবৃত্তিপরায়ণ হইলেও অন্তরে তাঁহার প্রবৃত্তি থাকিয়া যায়। জ্ঞানী ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও অভিমানশূন্যতার জন্য তাহা নিবৃত্তি ফলই প্রদান করে—বন্ধনের কারণ হয় না। ধন্য সেই জ্ঞানী পুরুষ যিনি বাহ্য দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত, সমাধিস্থ, জড়বৎ বা পণ্ডিত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও নিজে অনুভব করেন যে তিনি এ সকল কিছুই নন—অর্থাৎ তিনি এ সকল চিত্ত-ধর্মের সহিত অসংশ্লিষ্ট শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মা। শান্ত-চিত্ত জ্ঞানীপুরুষ জনাকীর্ণ স্থানে যাইবার জন্যও উদ্‌গ্রীব হন না, আবার নির্জন বনে যাইবার জন্যও ব্যাকুল হন না। প্রারব্ধবশে যখন যে স্থানেই তাঁহাকে যাইতে বা থাকিতে হয়—সে সকল স্থানকেই তিনি সমান জ্ঞান করিয়া শান্ত ভাবে অবস্থান করেন।

* * *

গীতা, বিবেকচূড়ামণি এবং অষ্টাবক্র-সংহিতার অন্যান্য স্থলেও এবং পঞ্চদশী, বেদান্তসার, সূত-সংহিতা, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি

অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ক আরও অনেক গ্রন্থেও জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ-সকল বিবৃত আছে। স্থানাভাবে সে সকলের উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়, তাহার প্রয়োজনও নাই; কারণ, মূলকথা সর্বত্রই সমান। ব্রহ্মজ্ঞানে যোগীর সকল প্রকার ভেদজ্ঞান দূর হয় এবং সাধারণ লোকে যাহাকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন বিষয় বলিয়া মনে করে, যথা—সুখ ও দুঃখ, শত্রু ও মিত্র, আপন ও পর, লাভ ও ক্ষতি, জীবন ও মৃত্যু, জীব ও ঈশ্বর, ব্রহ্ম ও জগৎ—সেখানেও তিনি সমরস শুদ্ধ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ নিজ আত্মাকেই শুধু দর্শন করেন। ইহার ফলে অপরের দৃষ্টিতে তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, নিজে তিনি অন্তরে, বাহিরে, সদা সর্বদা আনন্দরসেই নিমগ্ন থাকেন। তিনি অনুভব করেন :—

ময্যখণ্ডসুখাম্ভোধৌ বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুতবিভ্রমাৎ॥

—বিবেকচূড়ামণি : ৪৯৬

অর্থাৎ, আমি অখণ্ড সুখসাগর। আর এই যে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বজগৎ কখনও বা (জাগরণে ও স্বপ্নাবস্থায়) উদিত হইতেছে এবং কখনও বা (সুষুপ্তিতে ও সমাধি অবস্থায়) বিলীন হইতেছে তাহা সেই সুখসাগররূপ আমাতেই মায়া রূপ বায়ুপ্রবাহে সৃষ্ট ঊর্মিমালা (সুখসাগর রূপ আমা হইতে পৃথক্ কিছু নয়)।

ওঁ তৎ সৎ

অস্ত্যুপায়ো মহান্ কশ্চিৎ সংসারভয়নাশনঃ।
যেন তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিং পরমানন্দমাপ্স্যসি॥ ৪৪

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু॥ ৪৫

—আচার্য শঙ্কর : বিবেকচূড়ামণি

অর্থাৎ

একটি অতি মহান্ উপায় বা পথ আছে—যাহা দ্বারা সংসারভয়ের নাশ হয় এবং ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দ লাভ করা যায়। বেদান্ত বা উপনিষদের তাৎপর্য বিচার বা অনুধাবন করাই এই পথ। ইহা দ্বারা সংশয়াদিরহিত অতি উত্তম জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই জ্ঞানোৎপত্তিমাত্রই জীবের যাবতীয় সংসারদুঃখের আত্যন্তিক অবসান হয়।

12,421
Ramakrishna Math
Probationers' Training Centre Library
P. O Belur Math Howrah

সরল বিচারে অদ্বৈতবাদ

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উৎসর্গ	৫	ব্যাখাস্তা	ব্যাখ্যাতা
,,	৬	মুর্তি	মূর্তি
৯	৭	সবল	সচল
৩৯	১৯	জগদান্তর্গত	জগদন্তর্গত
৬১	২৪	প্রচরণ	প্রচরন্
৬৪	৪	বিশেষ	বিশেষ-
,,	৬	ভোক্তঃ	ভোক্তৃঃ
৬৮	১৬	ভিত্তিমঃ	ডিণ্ডিমঃ
৬৯	৭	সম্মাদন্তন্	স্বম্মাদন্তন্
৭০	১৩	দেহাত্মহমেস্তমেতৎ	দেহাত্মহমস্তমেৎ
৭৮	২৩	শিচদ্যন্তে	শ্ছিদ্যন্তে
৭৯	১৬	লদ্ধ্বা	লব্ধ্বা
,,	২২	দরস্তরং	দরমন্তরং
৮৫	৯	নিবহিতা	নির্বহিতা
৮৭	১০	চানস্তামি	চানন্তানি
৮৮	১	মন্বীজ্ঞা	মন্বীথা
,,	১	বিথাতে	বিজ্ঞাতে
,,	১৮	মন্ত	মন্তৃ
৮৯	১৭	অথাকায়মানো	অথাকাময়মা
১০২	১৫	হ্যাত্বৈব	হ্যাত্মৈব
,,	২০	আত্মবিৎ ॥	আত্মবিৎ ॥ :
১০৮	২৭	সম্পত্যভাবে	সম্পত্ত্যভাবে
১১০	২৪	সংহৃত	সংহৃত
১১২	২২	শিছন্দন্তে	শ্ছিদ্যন্তে
১১৩	৮	পুরুষ	পুরুষে
১১৪	২৫	আয়ত্ত্বীভূত	আয়ত্তীভূত
১১৬	১২	মার্য্যে	মার্য্যৈ
১১৯	১১	প্রমাদানর্থো	প্রমাদাদনর্থো
১২০	২২	স্তদারাম	স্তদারাম
১২৯	২৬	ন্ ভ্রান্তো	দ্ ভ্রান্তঃ
১৩৪	৯	বিপ্লাপনং	বিগ্লাপনং
১৪০	১৪	লক্ষ্যণীয়	লক্ষণীয়
,,	২১	পাণ্ডবঃ	পাণ্ডব
১৪৭	২৪	ইহিত্বা	ঈহিত্বা
১৭৮	৩	নিরঙ্কারো	নিরহঙ্কারো -